ভালোবাসা প্রতিলতা

সেলিনা হোসেন

ভালোবাসা প্রীতিলতা

সেলিনা হোসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উৎসর্গ

উত্তরা চক্রবর্তী মালেকা বেগম
প্রীতিলতার একশতম জন্মদিনের
অনুষ্ঠানে বেথুন কলেজ,
কলকাতায় একত্র হওয়ার কয়েকটি
দিনের স্মরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এখন ফাঁসির আসামি। আলিপুর জেলে মৃত্যুকুঠুরিতে দিন গুনছে। হাইকোর্টে আপিল করা হয়েছে।

দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় খবরটি পড়ে প্রীতিলতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। কোন রামকৃষ্ণ? চট্টগ্রাম কলেজে একজন পড়তেন, ভালো ছাত্র হিসেবে নাম শুনেছিল। বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করছিল রামকৃষ্ণ। কখনো দেখা হয়নি। যদি সেই রামকৃষ্ণ না হয়, তবে তো অন্য কেউ হবে। তাতে কিছু এসে যায় না। প্রিয় শহর চট্টগ্রাম। বিপ্লবীদের অনেকেই চট্টগ্রামের। যে রামকৃষ্ণই হোক, সে তার চট্টগ্রামের। প্রীতিলতা স্তব্ধ হয়ে-থাকা থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদপত্রের অন্য পৃষ্ঠায় যায়। কিন্তু পড়া হয় না। আবার নিজের ভাবনা তাকে স্তব্ধ করে দেয়। পত্রিকা ভাঁজ করে নিজের হাতের মুঠোয় রাখে।

ওর প্রিয় চট্টগ্রামের বিপ্লবী রামকৃষ্ণের কথা ও আগে কখনো শোনেনি। নামটাও জানা ছিল না। তবু একই জেলার বলে ওকে বেশি কাছের মানুষ মনে হয়। এই অনুভব এক ধরনের হৃদয়ের বন্ধন, যে বন্ধন দিয়ে অনেক দূরের মানুষ কাছে আসে, যা নিবিড় হয়ে প্রীতি, ভালোবাসা, মমতার ঘেরাটোপ তৈরি করে। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং ফাঁসির আসামি — এই চারটি শব্দ দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠার অন্যসব অক্ষর মুছে দিয়ে বিশাল হয়ে ওঠে। শব্দগুলো পরস্পরের সঙ্গে এত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অন্তত প্রীতিলতার দৃষ্টি থেকে কিছুতেই দূরে সরে না। ফলে প্রীতিলতা অস্থিরতা বোধ করে। মনের ভেতরে ইচ্ছার কাঠঠোকরা পাখিটা কুটকুট শব্দে ঠুকরে যাচ্ছে। বলছে, আমি ওকে দেখতে চাই। একবার, শুধু একবার দেখব। এখন এই কলকাতা শহরে আমি আছি। এত কাছে থেকে আমি যদি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে না দেখি, তবে নিজেকেই ক্ষমা করতে পারব না। ওকে দেখে, ওর মৃত্যুর সাহস বুকে নিয়ে ফিরে যাব চট্টগ্রামে।

নিজের এই ইচ্ছায় চমকে ওঠে ও। নিজেকে নিয়ে বিব্রত বোধ করে। তারপর নিজেকে শাসায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এ কী ভাবছ, প্রীতিলতা! নিজে বিপ্লবী হয়ে জান না যে, গোপনীয়তা বিপ্লবীদের প্রাথমিক শর্ত।

জানি, জানি। তবু একজন মৃত্যুপথযাত্রী সাহসী মানুষকে আমার দেখতেই হবে। এইসব মানুষ হাজার হাজার জন্মায় না। এদের দেখতে যাওয়া পুণ্যের কাজ। ভগবান আমার সহায় হবেন।

প্রীতিলতা জানালায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে খোলা প্রান্তর — যতদূর চোখ যায়, কেবলই সবুজ। হোস্টেলের মেয়েদের কথা ভেসে আসছে। যেন কলধ্বনি নয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। কাছে কোথাও বোমা ফাটল বুঝি, নাকি কেউ পিস্তলের ট্রিগার টিপল। প্রীতিলতা দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে। না, কোথাও তো কোনো শব্দ নেই। বাইরে পাখি ডাকছে একটি। মনে পড়ে, ছোটোবেলায় ক্ষুদিরামের কথা শুনেছিল। ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ কি ক্ষুদিরামের মতো মৃত্যুকুঠুরিতে বসে হাসছে? মরণ কী? মরণ কেমন? দর্শনের ছাত্রী প্রীতিলতা মৃত্যুর কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিছুতেই ভাবতে পারে না যে, মরণ এক গভীর অন্ধকার। ওর মনে হয়, মরণ স্বপ্নময় জগৎ — মানুষ যে স্বপ্ন দেখে নিজে বাঁচে এবং অন্যকে বাঁচতে শেখায়, অন্তত তেমন মৃত্যু — ফাঁসির আসামি যাকে বীরের মতো বরণ করে। মৃত্যুকে জীবনের স্রোত বলা যায়। একজন থেকে আর একজনের কাছে আসে মহত্ত্বের বাণী নিয়ে। দেশের জন্য, মানুষের জন্য অবিনাশী বাণী। মৃত্যু তো ক্ষুদিরামের হাসিকে ম্লান করতে পারেনি। রামকৃষ্ণের হাসিকেও পারবে না। তখন প্রীতিলতার চোখের সামনে যতদূর দেখা যায়, সবুজ প্রান্তরটি অজস্র ফুলে রঙিন হয়ে ওঠে। মৃত্যুকে ফুলের মতো দু-হাতে নিয়ে রামকৃষ্ণ হেঁটে আসছে। পত্রিকার পৃষ্ঠার এই খবর ওকে তাড়িত করে না। ও বুঝতে পারে যে, ওর এই অস্থিরতা কোনো দুঃসংবাদ শোনার জন্য নয়। এই অস্থিরতার মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ আছে। চিত্তচাঞ্চল্যের তাড়না আছে। এই আবেগ একজন বিপ্লবী থেকে অন্য বিপ্লবীতে সঞ্চারিত হয়। ফলে যত বিপদই হোক, রামকৃষ্ণকে দেখার জন্য প্রীতিলতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। এই দেখা করার মধ্যে বিপ্লবীদের গোপনীয়তা রক্ষা করার শর্ত ও কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করবে না।

ও জানে না, কীভাবে দেখা হবে। তবু এই প্রতিজ্ঞাটুকু মাথায় রেখে ও ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসে। কারো সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা নেই। বুকের ভেতরের কাঠঠোকরা এখন স্থির, ঠোকর দিয়ে শব্দ করবে না, শান্ত করে দিয়েছে ওকে। কারণ ওর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। পাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েরা। ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলে। ও তেমন জবাব দেয় না। শুধু মাথা নাড়ে। লক্ষ্য নির্ধারিত হলে মানুষের আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়। প্রীতিলতার এখন তেমন সময়। নিজেকে ভারী মনে হচ্ছে, বয়সে এবং মননে। কলেজের বান্ধবীরা বুঝি ওর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো — ওদের সঙ্গে ওর এক যোজন ব্যবধান। ওদের বোঝার বয়স হয়নি। আর যাদের বোঝার বয়স হয় না, তাদের সঙ্গে তো ভাবনার ভাগাভাগি হয় না। এসব ভাবনায় নিজেকে খানিকটা হালকা করবে ভেবেছিল, কিন্তু হল না। তবু ওর গলার কাছে কষ্ট দলা পাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে ওই ফাঁসি শব্দটি ওর গলার চারপাশ বেষ্টন করে রেখেছে। সপ্রতিভ উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্ণতার আবরণ। প্রীতিলতা কাঁদতে চায়। ও ছাদে উঠে আসে। শীতের রাত, বেশ কনকনে ঠান্ডা পড়েছে। চারদিকে সাদা কুয়াশা। কুয়াশা যেন শরীরের ওপর বসে যাচ্ছে। ভিজে উঠছে শরীরের অনাবৃত অংশ। প্রীতিলতা গায়ের চাদর দিয়ে মাথা ঢাকে। ডান হাতের তর্জনি দিয়ে নাকের ডগা মুছে নেয়।

ছোটোবেলায় খুব ভোরে শিশিরে পা মাখামাখি করে ঘরে ফিরত। এত ভোর যে, মা তখনো ঘুম থেকে উঠত না, বাবাও না। বাগানের ঘন ঝোপের আড়ালে ছিটেফোঁটা আলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। কখনো প্রবল হাঁচি এলেও দু-হাতে নাক চেপে ধরত। ভয়, পাছে হাঁচির শব্দে বাগানের আলো ছিঁড়ে যায়। দিনের প্রথম আলোর মায়াবী স্পর্শে জাদু ছিল মনে হত। সেই স্পর্শ মুছে যাক, সেটা ও চাইত না। বরং প্রতিদিন ভোরে ও প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে হাত বাড়াত, যদি ছুঁয়ে দেখা যায় আলোর রেখা। সেই বয়সে ও বুঝে গিয়েছিল যে, ছোঁয়া যায় না আলোর রেখা। কিন্তু বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে বুঝতে পারে, ইচ্ছে করলেই আলোর রেখা ছোঁয়া যায়। এই স্পর্শ অদৃশ্য এবং মৃত্যুর মতো শীতল। রামকৃষ্ণ তো এখন আলোর রেখা ছুঁয়ে আছে। আলো গাঢ় হয়ে উঠলে বাগানের লাল জবা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ও। সূর্য-ওঠা দেখত। মনে হত এতকিছুর মধ্যে কীসের যেন অভাব আছে। ধুলো-ওড়া রাস্তায় হেঁটে আসত পাড়ার মণীশ বুড়ো। লোকটি সাহেবদের বাংলোয় মালির কাজ করত। প্রীতিলতা দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলত, 'আজ কী ফুল ফুটেছে কাকা?'

মালি হলুদ হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বের করে বলত, 'নীলপদ্ম।'

'নীলপদ্ম!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চেঁচিয়ে উঠত প্রীতিলতা, 'অপূর্ব না!'

'হ্যাঁ, অপূর্ব! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যাবে পুকুরের ধারে? চলো, দেখবে।'

প্রীতিলতা একটুক্ষণ থমকে থেকে বলত, 'সাহেবদের বাড়ির সাজানো-গোছানো বাগান আমার ভালো লাগে না। আমাদের এই বুনোভাবে বেড়ে ওঠা বাগানটাই ভালো। ওরা তো বিদেশ থেকে গাছ এনে লাগায়। আর আমাদের বাগানের এই গাছগুলো সব দেশি।'

'ঠিক বলেছ।'

মণীশ হাসতে হাসতে চলে যায়। ওর চোখে পিচুটি। ময়লা জামা-কাপড়। হাঁটতে গেলে পিঠটা বেঁকে যায়। একবার সাহেবের বুটের লাথি খেয়ে কোমরে খুব আঘাত পায়। দু-মাস বিছানায় ছিল। তারপর থেকে পিঠটা অমন বেঁকে গেছে। তবু সাহেবের বাড়ির কাজ ও ছাড়েনি। বাড়িতে বারোটি ছেলেমেয়ে। সব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরে খাবার না থাকলে নরক হয়ে যায় বাড়িটা। সাহেবের পা ধরে থাকা ছাড়া মণীশের অন্য কোনো উপায় ছিল না। কিছু উপায় অন্যভাবে করে নেওয়ার সাহসও কম ছিল। ওকে দেখে প্রীতিলতার মায়া হয়। প্রীতিলতা বড়ো হওয়ার আগেই মণীশ মরে যায়। মৃত্যুর খবরটা শুনে ও খুব কেঁদেছিল। লাথি খাওয়ার ঘটনাটা এখনো ওর মনে আছে। ও সেদিন তেমন কিছু বোঝেনি। দেখেছিল ওর বাবা খুব উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, 'আমরা কি মানুষ না? এমন করে মারবে?' ওর বাবা সহজে রাগ করত না। নিজেও সরকারি চাকরি করত বলে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলত না। কিন্তু মণীশের মার খাওয়ার ঘটনা সহ্য করতে পারেনি। লোকজন ধরাধরি করে মণীশকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ওর বাবার হাত ধরে প্রীতিলতাও দেখতে গিয়েছিল মণীশকে। তারপর ভালো হয়ে গেলে একদিন ও মণীশকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সেদিন খুব ব্যথা পেয়েছিলে, কাকা?'

'হ্যাঁরে মা। খুব লেগেছিল। মনে হয়েছিল হাড্ডি বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।'

'তুমি প্রতিশোধ নিতে পার না?'

'প্রতিশোধ, কেমন করে?'

'সাহেবটাকেও একটা লাথি দিতে। পারতে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তা কি হয়? আমার কি অত সাধ্যি আছে? জীবনের ঘানি টানতে টানতে সব সাধ্য শেষ করেছি। মামণি, আর পারি না।’

নুয়ে গিয়েছিল মণীশের মাথা। যেন ভীষণ লজ্জায় তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই বালিকার সামনে নিজের না-পারা অনেক বড়ো হয়ে উঠেছিল। তার বেঁচে থাকার সবটুকুতে প্রবল গোলমাল শুরু হয়েছিল। এক সময় মাথা সোজা করলে প্রীতিলতার মনে হয়েছিল, তার চোখে ঝিলিক। এই নতুন কাকাকে দেখে প্রীতিলতা হাততালি দিয়ে বলেছিল, ‘আমার মনে হচ্ছে, কাকা, তুমি প্রতিশোধ নিতে পারবে।’

মণীশ প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে এবং ঘাড় উঁচিয়ে বলেছিল, ‘প্রতিশোধটা তুই নিস। তোকেই প্রতিশোধ নিতে হবে, মামণি।’

‘আমি! কাকা, তুমি কী বলছ? আমি? আমি কেমন করে প্রতিশোধ নেব?’

‘তুই তো একদিন বড়ো হবি, মা।’

মণীশের কথায় চমকে গিয়েছিল প্রীতিলতা।

উচ্ছ্বসিত হয়ে মণীশের খুব কাছ ঘেঁষে বসে বলেছিল, ‘ঠিক আছে, আমি প্রতিশোধ নেব। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।’

মণীশ ওর ঘাড়ে হাত রেখে গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল, ‘পারবি? পারবি তো, মা? সোনা আমার। যেদিন তুই পারবি, সেদিন তোকে আমি বাগানের সব ফুল দেব। একটা ফুলও কোনো গাছে থাকবে না।’

‘সত্যি, কাকা?’

‘হ্যাঁরে, একদম সত্যি।’

‘আমি বড়ো হতে হতে তুমি যদি মরে যাও?’

মণীশ ভ্রূ কুঁচকে বলে, ‘মরে তো যেতেই পারি। তবে মরে গেলে তোকে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করব। বল পারবি?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘পারব। তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, আমি ঠিকই পারব।’

প্রীতিলতা দ্বিধাহীন উত্তর দিয়েছিল। মণীশের কণ্ঠস্বরে ও বুঝেছিল যে, লোকটির ভেতরে জ্বালা আছে, কিন্তু সাহস নেই। নাই থাকল, একজনের ভীরুতাকে তো অন্যজন পুষিয়ে নিতে পারে। মণীশের মতো হাজার জনের ভীরুতা ও পুষিয়ে দেবে।

মণীশ অবাক হয়ে বলেছিল, ‘যদি তোকে মেরে ফেলে?’

‘মরলে কী হয়? একদিন তো মরতে হবেই।’

সহজে সেদিন এই কথাটা উচ্চারণ করেছিল প্রীতিলতা। বুড়ো মণীশ হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, ‘তোর মতো আমি তো বলতে পারি নারে? সাহেবের লাথি খেয়েও আমার যে বেঁচে থাকার শখ।’

প্রীতিলতা সেই কথা শুনে শব্দ করে হেসেছিল। বলেছিল, ‘ঠিক আছে, তুমি বাঁচ। তোমার শত আয়ু হোক।’

না, শত আয়ু পায়নি মণীশ। সাহেবদের বাড়িতে কাজ করেই জীবন কাটিয়েছে। বাষট্টি বছরেই মরে গেল। এখন এই ছাদে দাঁড়িয়ে প্রীতিলতা দাঁত কিড়মিড় করে, শুধু দু-মুঠো ভাতের জন্য মণীশকাকা গোলামির জীবন কাটিয়েছে। এই জীবনের একশো বছরই কি আর বিশ বছরই কী! রামকৃষ্ণের মতো সাহসী জীবনের জন্য বিশ বছরই একশো বছরের সমান। বেঁচে থাকার বড়ো সাধ ছিল মণীশের। রামকৃষ্ণের নেই। আমি রামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলব। দেখব ও কেমন করে বিশ বছরের আয়ুষ্কালকে একশো বছর করে তুলেছে।

প্রীতিলতা বুঝতে পারে, ওর জীবনে এ এক ভীষণ সময়। পত্রিকার পৃষ্ঠার একটি খবর ওকে ওলটপালট করছে, ছিন্নভিন্ন করছে। নারীদের প্রসববেদনার কথা ও শুনেছে। যেহেতু ওর নিজের অভিজ্ঞতা নেই, সেজন্য কখনো মা-মাসিদের গল্প ওকে ভীত করে তুলত। কিন্তু ওঁরা যখন উদ্ভাসিত আনন্দে গদগদ হয়ে বলতেন, শিশুর মুখ দেখলে কোনো বেদনা থাকে না, তখন ওর ধারণা হত আসলে বেদনা নয়, সবটাই আনন্দ। নারী থেকে মাতৃত্বে রূপান্তর-বেদনার আনন্দ। ও বুঝতে পারে এখন ও তেমন একটি সময়ে আলোড়িত হচ্ছে। ওর জীবনে এ এক ভীষণ রূপান্তরের সময়। বিপ্লবীদের খাতায় নাম ওঠানোর পরও ও নিজেকে এমনভাবে অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

করেনি। সে অনুভব ছিল প্রতিজ্ঞার, দৃঢ়তার — এখনকার অনুভব একান্তই আবেগের, হৃদয়ের। এখন ওর রাতদিনে ঘন কালো মেঘ প্রবল বর্ষণের অপেক্ষায় গুড়গুড় করছে। একজন অদেখা রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ওর বিপ্লবী জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রীতিলতা ছাদে পায়চারি করে। ও একসময় থমকে দাঁড়ায়। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর বুক কেমন করে। ও নিজেও একজন বিপ্লবী। দেশমাতৃকার মুক্তি ওর স্বপ্ন। ও জানে বিপ্লবীরা মৃত্যুকে অবধারিত সত্য বলে জানে। তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। তবু সেই মানুষটিকে ও দেখতে চায়। জানতে চায় ওর হৃদয়ের কথা। যারা বেঁচে থাকে তাদের জন্য ওদের কি কিছু বলার আছে? প্রীতিলতার হৃদয়ে ব্যাকুলতা। কয়েক মাস আগে চট্টগ্রামে জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধে মারা গেছে ওর দূর সম্পর্কের এক ভাই। খবরটা শোনার পর ওর কষ্ট হয়েছে, কেঁদেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধের আগুন ওকে দৃঢ় করেছে। যুদ্ধের মৃত্যুতে মৃত্যুর অপেক্ষার যন্ত্রণা নেই। রামকৃষ্ণ তিলে তিলে সেই মৃত্যুর অপেক্ষার যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করছে। আহ্ রামকৃষ্ণ, তুমি আকাশের কোন তারাটা হয়ে ফুটে থাকবে? আমি জানি, প্রবল অহংকার তোমার এই দেশ — তোমার মাতৃভূমি। আমি জানি, উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো তুমি ছড়িয়ে রাখবে এই দেশের ওপর। এখানে প্রতিদিন বুনো গাছে বাগান ভরে উঠবে, ফুল ফুটবে, ঘাস জন্মাবে কিন্তু তোমার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মণীশকাকারা আর কোনোদিন সাহেবের বুটের লাথি খাবে না। রামকৃষ্ণ, আমি তোমার কাছে পৌঁছতে চাই। আমি অনেক বড়ো ত্যাগ করতে চাই। তোমার সঙ্গে কথা বলেই আমি বুঝতে পারব যে, মৃত্যুর স্বরূপ কী? মৃত্যু তোমার কাছে এত সহজ কেন?

প্রীতিলতা কতক্ষণ ছাদের এ-মাথা ও-মাথায় হাঁটে তা মনে রাখে না। ও নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকে। এক সময় মনে হয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে কোনো বান্ধবী। নিজেকেই উত্তর দেয় ও, আজ আর কারো ডাকে সাড়া দেব না আমি। আজ তোমরা আমাকে বিরক্ত করবে না। আমি যদি কোনো বিষয়ে ঝুঁকি, তবে মনেপ্রাণে ঝুঁকি।

আমার ডাক নাম রানি।

কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়তে এলে, মা প্রায়ই বলতেন, আমার সংসার-রাজ্যটা রানি-শূন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আমার ছোটো বোন শান্তি।

ও আমাকে দিদি ডাকলেও ওর সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। ওকে আমি রামকৃষ্ণের কথা বলব। আমাদের বাড়ির কাছের ঝরনার ধারে বসে দু-বোনে বিপ্লবীর কথা বলব। ও প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব। ঝরনার কুলকুল শব্দ-তরঙ্গে মিশে যাবে বিপ্লবীর সাহস আর মৃত্যুর কথা।

চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ঘিরে ঝরনার জল গড়ায়। বয়ে যায় কর্ণফুলি নদীর দিকে। কি যে স্বচ্ছ জল! বালি আর পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে গড়ায় জল। আমরা পা-ডুবিয়ে পার হয়ে যাই। কখনো ছোটো পাথরখন্ডের উপর বসে পা ডুবিয়ে থাকি। এমন একটি জায়গা আমাদের আনন্দের জায়গা। যেখানে বসে রামকৃষ্ণের কথা বলা যাবে শান্তিকে। আনন্দ আর সৌন্দর্যের মধ্যে কি মৃত্যুর ছায়া থাকে?

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ছাদের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রীতিলতা। এক সময় ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই বলে, থাক। বিপ্লবের সঙ্গে আম-কাঁঠালের বাগান ও পোড়োজমি থাকে। শুকনো ঝরা পাতার উড়ে যাওয়া থাকে। থাকে নিস্তব্ধ বনরাজিকে মুখর করে তোলা পাখির গান। এমন প্রকৃতির মধ্যেই তো ও বড়ো হয়েছে। এই জমিন থেকে বিপ্লবের জন্য বেরিয়ে আসতে পারলে, মৃত্যু থাকবে না কেন সেখানে? থাকবে, অবশ্যই থাকবে। মৃত্যু জীবনের শেষ কথা নয়, মৃত্যু শুরুও। রামকৃষ্ণের পরে আমি থাকব। আরো অনেকে থাকবে। আমারও যদি মৃত্যু হয় তাহলে অন্যরা থাকবে। সূর্যদাদার যদি মৃত্যু হয়, তাহলেও অন্যরা থাকবে। ব্রিটিশকে এই জায়গা থেকে চলে যেতেই হবে।

ও দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে। একই গতিতে বারান্দা পার হয়ে নিজের ঘরে যায়। চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর কনুই রেখে দু-হাতে মুখ ঢাকে। ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

২

পিসিমা প্রীতিলতার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। দেখতে পায় মেয়েটার চোখেমুখে আজ অন্য এক ছাপ — একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং মমতা-ভালোবাসা সব জড়িয়ে আছে ওর চেহারায়। পিসিমা ওর আবেগকে উপেক্ষা করতে পারে না। সে নিজেও তো এই আবেগ নিয়ে আলিপুর জেলে ফাঁসির আসামি দীনেশ গুপ্তকে দেখতে যায়। এই আবেগ দিয়েই তো বিপ্লবীদের আশ্রয় তার কাছে। ওরা তাকে নির্ভর করে, আপনজন মনে করে। ওদের জন্য কিছু করতে পারাকে সে নিজের দায়িত্ব মনে করে। ওরা মরণ মাথায় নিয়ে পথে নামলে, ও নিজে পারবে না কেন ওদের সঙ্গে সামিল হতে। দেশমাতার মুক্তি কি সহজ কাজ! ছেলেরা তার কাছে একমুঠো ভাত খেতে আসে, নাহলে রাত্রিবাসের জন্য। আর কিছু তো চায় না। সাধ্যের মধ্যে যা আছে, তা দেবে না কেন? ওরা খুশি হয়। ওই সামান্যটুকু পেয়ে যাবার সময় বলে, 'তোমার এই আশ্রয়টুকু আমাদের জন্য ছায়া। নইলে কলকাতার নির্মেঘ আকাশের নীচে আমরা তো পুড়ে যাই।'

ওরা পোড়ে না। ওরা পুড়ে যাওয়ার সন্তান নয়। এই পুড়ে যাওয়া ওদের ভালোবাসার আবদার।

এই একই আবদার প্রীতিলতার কণ্ঠেও। ও জানে দীনেশ গুপ্তের পাশের সেলেই রামকৃষ্ণকে রাখা হয়েছে। পিসিমাই তাকে এই কথা বলেছে।

'চুপ করে আছ কেন পিসিমা? বলো না তুমি কি তাকে দেখেছ?'

'না দেখিনি। ওর কথা তো সবার কাছে শুনছি কেবল।'

'আমি একবারটি দেখা করতে চাই। তুমি তার ব্যবস্থা করো।'

'ভেবে দেখি। একটা বুদ্ধি তো বের করতে হবে।'

'তোমার তো জেলে আসা-যাওয়া আছে। জেল কর্তৃপক্ষকে বলে একটা ব্যবস্থা করো না? পিসিমা তোমার পায়ে পড়ি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে পিসিমা। মেয়েটিকে আজ একদম অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে, দেখা করতে না পারলে ও ভেঙে পড়বে। পড়াশোনা মাথায় ওঠাবে। পিসিমা প্রীতিলতার ডান হাত নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় রামকৃষ্ণের বোন পরিচয় দিয়ে তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারি। জেলের একজন বাঙালি ভদ্রলোক বিপ্লবীদের এইসব ব্যাপার খুব সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন।'

প্রীতিলতা হাসতে হাসতে বলে, 'তোমার জয় হোক পিসিমা। তুমি দীর্ঘজীবী হও। লং লিভ রিভলিউশন।'

'আমি বুঝি রিভলিউশন?'

'সে কাউকে বলে বোঝাতে হবে না যে, তুমি আগাপাছতলা কী!'

পিসিমা ওর হাত গায়ে ছুঁইয়ে বলে, 'সে তো বুঝলাম। কিন্তু পড়ালেখা ঠিকমতো করছিস তো?'

'তুমি কি দেখেছ আমার পরীক্ষার ফল কখনো খারাপ হতে?'

'পাগলি। তুই আমাদের গর্ব। তোর মতো মেধাবী মেয়ে কি হয়! তুই যে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিস, এটা যে কত বড়ো কথা!'

'তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো পিসিমা।'

পিসিমা ওর মাথায় হাত রাখে। তারপর একপ্লেট মিষ্টি নিয়ে আসে।

'নে, খা। খেয়ে শেষ করবি কিন্তু।'

'এত মিষ্টি? এত মিষ্টি খেয়ে আমি কলেজের হোস্টেলে ফিরতে পারব না। পেট ফেটে মরেই যাব।'

'এত কই রে? মোটে চারটে। এখনই তো খাবার বয়স। এখনই খেতে হবে। নইলে আমার বয়সে পৌঁছোলে খেতেই পারবি না।'

'তুমি যেভাবেই বোঝাও না কেন পিসিমা, আমি খেতে পারব না। একদমই পারব না। কদিন ধরে কিছুই খেতে পারছি না। খেতে ইচ্ছেও করে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘কেন রে? কী হয়েছে? মন খারাপ, না কি শরীর খারাপ?’

‘বোঝো না কেন? জেলের বিপ্লবীদের কথা মনে হলে, আর কিছু ভালো লাগে না। আমার শরীর-মন সবই খারাপ।’

‘ভালো কথা নয় প্রীতিলতা। আমাদের শক্ত হতে হবে। আমাদের সামনে অনেক কাজ। একজন মানুষের জন্য আমাদের অন্য কাজ থেমে থাকতে পারে না। দুঃখ কীসের? বিপ্লবীদের পথ তো কাঁটা-বিছোনো। বিপ্লবীদের জীবন-মৃত্যু তো প্রত্যেকের হাতের মুঠোয়।’

প্রীতিলতা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, ‘আমি জানি পিসিমা। তবু তো আমরা মানুষ! আমাদের হৃদয় আছে। আমাদের ভেতরে মন-তোলপাড় করার ঘটনাও ঘটে।’

পিসিমা একটু থমকে যায়। তারপরে নিজের কণ্ঠস্বর নীরেট করে বলে, ‘কিন্তু মাস্টারদার তো কঠোর নির্দেশ আছে যে, কোনো মেয়ে, ছেলে-সদস্যের সঙ্গে আলাপ করতে পারবে না।’

‘জানি’, প্রীতিলতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। চামচ দিয়ে প্লেটের ওপর মিষ্টি নাড়াচাড়া করে। তারপর মৃদু হেসে বলে, ‘পিসিমা আমি কোনো ছেলে-সদস্যের সঙ্গে দেখা করতে তো যাচ্ছি না। রামকৃষ্ণ কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে।’

পিসিমা শব্দ করে হেসে ওঠে, ‘বুঝেছি তুই কী বলতে চাস। রামকৃষ্ণ আর তোর অবাধ মেলামেশার সুযোগ নেই। পার্টির গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে না। অর্থাৎ, মাস্টারদার কোনো ভয়ের কারণ নেই।’

প্রীতিলতা গভীর চোখে তাকায়। সে দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে। পিসিমার ভেতরটা কেঁপে ওঠে। মনে হয়, প্রীতিলতা বুঝি বোমার মতো ফাটবে। ঠিক সেই সময়ে প্রীতিলতা দৃঢ় গলায় বলে, ‘তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে, আমরাও মানুষ। একটি লোক বাবা-মা ভাইবোন থেকে কতদূরে, এক নির্জন কুঠুরিতে মৃত্যুর দিন গুনছে। আমাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই যে, মৃত্যুর শেষ দিনগুলোতে তাকে একটুখানি স্বস্তি দেওয়ার? বিপ্লবীরা কি পাথর পিসিমা?’

প্রীতিলতার কণ্ঠের দৃঢ়তায় পিসিমা চট করে কোনো জবাব দিতে পারে না। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বলে, ‘ওরা মৃত্যুভয়হীন রে। ওদের নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা নেই। আমি তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দেখেছি দীনেশ গুপ্তকে। ও কত সাহসের কথা বলে, শুনলে মন জুড়িয়ে যায়। আমার বিশ্বাস, রামকৃষ্ণও তেমন ছেলে। ওরা আমাদের ক্ষুদিরাম। ওদের মুখের হাসি মৃত্যুও স্তব্ধ করতে পারে না।'

প্রীতিলতা কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

'ও কি রে, মিষ্টিগুলো না খেয়েই উঠলি যে?'

'খেতে পারছি না। খেতে বোলো না।'

'কী হল তোর?'

'তুমি আমার দেখা করার একটা ব্যবস্থা করো। রামকৃষ্ণকে আমার দেখতেই হবে।'

'ভেবে দেখ প্রীতি, কাজটা কি ভালো হবে?'

'আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটাই থাকবে। এখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন নেই। যাই। কিছু করতে পারলে জানিয়ো।'

পিসিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রীতিলতার চলে যাওয়া দেখে। ও দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু সে দ্রুততায় কোনো টলমল ভাব নেই। ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাঁটে। যে সিদ্ধান্ত নেয় বুঝেসুঝে নেয়, সেখান থেকে ওকে সরিয়ে আনা শক্ত। ওর মধ্যে অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে। সেটাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ওর এই দৃঢ়তাই ওর সৌন্দর্য। ওর গায়ের রঙ কালো, বেশ কালো। কিন্তু ওর টানা আয়ত দু-চোখের দীপ্তি ওর কালো রঙে বিচ্ছুরিত হয়। যে কেউই বুঝতে পারে, মেধাবী মেয়েটি কীভাবে সৌন্দর্যের ধারণা পালটে দেয়।

রামকৃষ্ণকে আলিপুর জেলে দেখার ব্যবস্থা কীভাবে করবে, সেটা ভাবতে ভাবতে পিসিমা রান্নাঘরে আসে। ডালে পাঁচফোড়ন দিতে দিতে আনমনা হয়ে যায়। বারবার মনে হয়, কী গভীর মমতায় প্রীতিলতা বিপ্লবীদের অনুশাসনের নিষেধটুকু এড়িয়ে রামকৃষ্ণের কাছে যেতে চায়। পিসিমারও মনে হয়, বিপ্লবীদের এই মমতাটুকু থাকা উচিত। চমকে ওঠে প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে, 'আমরাও তো মানুষ।' গরম তেলে সাঁতলায় মশলা, ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দে ভরে যায় রান্নাঘর। শব্দ ছড়িয়ে যায় পুরো বাড়িতে। পিসিমার চোখ ভরে যায় জলে। প্রীতিলতাকে যতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

শক্ত থাকার কথা বলুক, নিজেরই এখন কাঁদতে ভালো লাগছে। ডালের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে, শোবার ঘরে এসে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে পিসিমা।

জানালার বাইরে কামিনী ফুলের গাছ। সাদা ফুল থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে। সেই গন্ধ বুকভরে টানলে মনে হয়, বিধিনিষেধ দিয়েই কি জীবনের শেষ রক্ষা হয়? হয় না। হয় না বলেই তো প্রীতিলতা খাওয়া ভুলেছে, ওর কাছে ছুটে এসেছে। তেমন হলে তো দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ, এমন নির্দ্বিধায় মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না। আসলে যেভাবে সম্ভব, যতটুকু সম্ভব, ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। দীনেশ তো উচ্চস্বরে কথা বলে, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় ভয়। কী অবলীলায় আলোচনা করে স্বাধীনতার কথা, মনে হয় না দীনেশের কোনো পিছুটান আছে। এতকিছু স্বাভাবিকতার পরও বুক টনটন তো থেমে থাকে না। পিসিমা আকুল হয়ে কাঁদে। প্রীতিলতা আজ তাকে কাঁদিয়ে দিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

৩

পরদিন রাতেই বোমা বানানোর খোল নিয়ে চট্টগ্রামে যেতে হল প্রীতিলতাকে। খুবই আকস্মিক সিদ্ধান্তে যেতে হল। পিসিমাকে বলে যাওয়া হল না আর। দু-দিনের বেশি থাকবে না। ফিরে এসেই পিসিমার কাছে যাবে।

ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম আসে না ওর। সিটের পেছনে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে রাখে, দ্রুতগামী ট্রেন। বাইরে রাত। তাই জানালা বন্ধ রেখেছে। দিনের বেলা হলে জানালা খোলা রাখাই ওর পছন্দ। কত দ্রুত সরে যায় নিসর্গের ছবি — যেন একটি থেকে অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু একরকম থাকে না — নতুন একটি গাছ আসে, আসে কয়েকটি পাখি কিংবা নদী বা দূরের পাহাড়। ওহ্, ভগবানের কত আনন্দ! ভগবান সৃষ্টির আনন্দ ছড়িয়ে রেখেছে মানুষের জন্য।

প্রীতিলতা চোখ খোলে।

যেন মাস্টারদা সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, এই ভূমিকে আমাদের করতে হবে। যে প্রকৃতিতে তোমার অধিকার, সেটা এখন বেনিয়া শাসকদের দখলে। যে তোমার অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে হয়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে জন্মভূমিকে মুক্ত করা যে কোনো দেশপ্রেমিকের প্রথম শপথ।

প্রীতিলতা আবার চোখ বোজে।

শুনতে পায় মাস্টারদার কণ্ঠস্বর, তোমাদের Dan Breen-এর My Freedom for the Irish Freedom বইটি পড়তে হবে। একবার পড়লে হবে না। বারবার পড়তে হবে। প্রত্যেক বিপ্লবী সদস্যের সঙ্গে এই বই নিয়ে আলোচনা করবে। Dan Breen আমার আদর্শ। আরো একটি কথা আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, কেবলই আত্মদান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এটাও বুঝি যে, মাত্র কয়েকজনের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা আসতে পারে না। আমাদের প্রচেষ্টা এবং সাফল্য দিয়ে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে হবে। আমাদের আত্মদানের মূল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এখানে।

প্রীতিলতা আবার চোখ বোজে। ঘুম নয়। গভীর ভাবনায় ডুবে যায় ও। বাবা-মায়ের কথা মনে হয়, ভাইবোনদেরও। বাড়িতে পৌঁছলেই সবাই একসঙ্গে হইচই করে উঠবে। মাস্টারদার কথা উঠলেই ওর কল্পনার কথা মনে হয়। বেথুন কলেজে কল্পনা ওর সহপাঠী। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কলেজের বাগানে বা ছাদে বসে দুজনে যখন কথায় মগ্ন হয়, তখন কল্পনা কথার ফাঁক পেলেই বলে, তাঁর কথায় সবকিছু তুচ্ছ করে চলতে আসতে পারি। আগে ভগবানকে ডাকতাম মনের শক্তি পাওয়ার জন্য। এখন ভগবানকে ডাকা ছেড়ে দিয়েছি, বলি মাস্টারদাই আমার ভগবান।

কল্পনার প্রবল শ্রদ্ধার কণ্ঠস্বর প্রীতিলতার দু-কান ভরে বাজে। ও পিঠ-ঘাড় সোজা করে বসে। মেরুদণ্ড টানটান করে। বুকের ভেতর শক্তির পাহাড় জমে। বুঝতে পারে, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সবটুকু জমিনে বিপ্লবীদের সাহসী উপস্থিতি ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই। ওম্ শান্তি! জন্মভূমির স্বাধীনতায় ওম্ শান্তি!

প্রীতিলতা একটুক্ষণ থমকে থাকে। এই মুহূর্তে শান্তি নেই, এই মুহূর্তে বিদ্রোহ। আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহী 'আয়ারল্যান্ড রিপাবলিকান আর্মি' নামকরণ মনে রেখে মাস্টারদা চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের নাম রেখেছেন 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা'। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ইস্টার বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮ এপ্রিল। সেদিনটি ছিল গুড ফ্রাইডে। শুক্রবার। সেই অনুযায়ী পরিকল্পিত হয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ছক। দিন এবং সময় এক রেখে। তারপর এক দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। ছোটোখাটো আকারের মাস্টারদার সাহস আর বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রীতিলতার চোখের সামনে ভাসে। ও সোজা হয়ে বসেই থাকে, যেন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। ওর ডানে-বামে সামনে-পেছনে আর কোনো পথ নেই। ও মাথা সোজা রাখলে বুঝতে পারে, ট্রেনের দুলুনিতে সে-মাথা নড়ে না।

ট্রেন চট্টগ্রাম শহরের কাছাকাছি হতেই প্রীতিলতা ভাবল, সেদিন বিপ্লবীরা যেমন চট্টগ্রামের দুটি অস্ত্রাগার দখল করেছিল, তেমনি পাশাপাশি টেলিগ্রাম ও টেলিফোন-যোগাযোগ এবং রেলওয়ে-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সেদিনের ঘটনা ভাবলে এখনো শরীরে কাঁপুনি জাগে। এই ঘটনার পরে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল। সেখানেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। তারপরে বিপ্লবীদের বেশিরভাগ জনই পলাতক জীবনে চলে যায়।

অন্যদিকে, চট্টগ্রাম শহরের সব পরিবারের তরুণদের উপর পুলিশ নজর রাখতে শুরু করে। সরকার এইসব তরুণদের বিভিন্ন রঙের কার্ড দিল। কাউকে দেওয়া হল লাল কার্ড, যারা বেশি সন্দেহভাজন, কাউকে দেওয়া হল নীল কার্ড। আর যারা বড়ো বেশি নিরীহ, তারা পেল সাদা কার্ড। পাশাপাশি পরিবারও ছেলেদেরকে যতটা সম্ভব ঘরে আটকে রাখার ব্যবস্থা করল। এসময় মেয়েরাই বড়ো কর্মী হয়ে উঠল। তারাই সাহায্য করতে লাগল পার্টির কাজে। প্রীতিলতা বড়ো করে হাই তুলে মনে মনে বলল, এজন্য আমাকে এত ঘন ঘন কলকাতা-চট্টগ্রাম করতে হয়। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টকে ম্যানেজ করা আমার জন্য কঠিন হয় না। মাঝে মাঝে ভোরবেলা ধানখেতের ভেতর দিয়ে আমাকে আসতে দেখলে, ছুটতে ছুটতে কাছে আসে শান্তি। আমার হাতের ছোটো সুটকেসটা নিজের হাতে নিয়ে আর একহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে বলবে, তুই যে কলকাতা কেন যাস দিদি বুঝি না। এখন থেকে তুই বাড়িতেই থাক না দিদি?

এক সময় ট্রেন থেকে নামে প্রীতিলতা। চট্টগ্রামে পৌঁছে গেছে। চারদিকে ভোরের আলো। তার সঙ্গে আছে স্নিগ্ধ বাতাস। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রিকশাস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় চট্টগ্রামের বাতাসে বারুদের গন্ধ। এই বাতাসই আমি চাই। ও জোরে জোরে শ্বাস টানে। কোনো অদৃশ্য থেকে কেউ বুঝি ওকে সাহসী হওয়ার বার্তা পাঠিয়েছে বাতাসে। বলছে, ভোরের নরম আলো বা স্নিগ্ধ বাতাস এখন উপভোগের সময় নেই। আমাদের অনেক কাজ।

'দিদিমণি, যাবেন?'

'যাব তো।'

'কোথায় যাবেন?'

'যেখানেই যাই, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। চলেন।'

প্রীতিলতা রিকশার পা-দানিতে সুটকেস রাখে। রিকশায় উঠে বসলে রিকশাওয়ালা আবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি জায়গার নাম ভুলে গেছেন?'

প্রীতিলতা উত্তর দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রিকশাওয়ালা আবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি এই শহরে নতুন?'

'আপনি একটা কিছু ধরে নেন দাদা। কথা বলতে ভালো লাগছে না। খুব মাথা ধরেছে।'

'ও আচ্ছা, আচ্ছা। ট্রেনে তো আর ঠিকমতো ঘুম হয় না। তাও আবার কলকাতা থেকে আসা। মাথাতো ধরবেই।'

রিকশাওয়ালা পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। ও চারদিকে তাকায়। ছোটোবেলা থেকে দেখে আসা শহরটা বদলাচ্ছে। কত কিছু ঘটেছে এখানে। এটা আসলে বিদ্রোহেরই শহর।

'বাঁয়ে, না ডানে, দিদি?'

'ডানে।'

'আপনি কি কলকাতায় লেখাপড়া করেন?'

'হ্যাঁ। কলেজে পড়ি। আপনি আর কথা বলবেন না। সামনে তাকান।'

'রাস্তার অবস্থা ভালো না। আর কতদূর যাবেন?'

'ওই তো সামনে। হাতের বাঁয়ে।'

'পায়ে-হাঁটা পথে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। অল্পই পথ।'

রিকশার ভাড়া চুকিয়ে, সামনে তাকালে দূর থেকে শান্তিকে দেখতে পায় প্রীতিলতা। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত ঘষছে। ওকে দেখতে পায়নি। প্রীতিলতা কাছে যাওয়ার আগেই পিঠ ঘোরালে ওকে দেখে অবাক হয়, 'দিদি তুমি? এমন অবাক করে দিতে পার যে তুমি!'

'এটাই তো মজা। তোদের অবাক করে দিয়ে মজা পাই।'

'এবার কিন্তু বেশিদিন থাকতে হবে।'

'তা হবে না। বাড়ি এসে বেশিদিন থাকলে কলেজ থেকে ছাঁটাই করে দেবে। দুদিন বাদে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

যাব।'

'চলো, ঘরে চলো।'

উঠোনে এসে দাঁড়াতেই রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো মা। ব্যস্ত-পায়ে ছুটে এল বাবা।

'রানি এখন তো কলেজ ছুটির সময় নয়। তুই এলি কী করে?'

প্রীতিলতা বাবা-মাকে প্রণাম করে বলে, 'কলেজের ছুটির জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। বড্ড মন টানে তোমাদের দেখার জন্য।'

দুজনে একসঙ্গে বলে, 'আহা রে, আমার সোনার মেয়ে।'

বাবা-মায়ের কণ্ঠস্বরে মেয়ের প্রতি গভীর আস্থা ঝরে পড়ে। স্নেহের তো শেষ নেই। মেয়ে যা বলে সেটাই ধ্রুব সত্যি। কোন কাজ নিয়ে এসেছে তা মনে রাখার দরকারই বা কি!

'আয়, ঘরে আয় মা। কী খাবি বল?'

'রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে, পান্তাভাত আর হাঁসের ডিম ভাজি খাব। তুমি রান্নাঘরে যাও। আমি আসছি।'

বাবা খড়ম পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে বুক-পিঠ চুলকে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ রে মা, দু-চার দিন বেশি থাকবি তো?'

'কেমন করে বাবা? কলেজের প্রিন্সিপাল কলেজ থেকে নাম কেটে দেবে। দেখা তো হল, এটাইতো অনেক, না বাবা? বলো, এতেই তুমি খুশি?'

জগবন্ধু প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, 'খুশি-খুশি।'

প্রীতি আর শান্তি উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে ঘরে যায়। ওদের পেছনে সন্তোষ। ও ভাবছে, দিদি কি ওর জন্য কিছু আনেনি? কয়েকটা লেবেনচুস? ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রীতিলতা ওর হাত ধরে বলে, 'আয়'। সন্তোষ দু-হাতে দিদিকে জড়িয়ে ধরে।

সেদিনই বোমার খোল পাচার হয়ে যায় সুবোধের মাধ্যমে। একদিন পরে প্রীতিলতা ঘোষণা দেয়, 'আমাকে কালই কলকাতায় যেতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘সে কি রে মা! কেন যে ছুটোছুটি করিস। শরীর খারাপ হবে।’

প্রীতিলতা হাসতে হাসতে বলে, ‘ট্রেনের দুলুনিতে শরীর খারাপ হয় না বাবা, ঘুম পায়।’

‘আয়, আমার সঙ্গে। আমার কাছে বসবি।’

প্রীতিলতা বাবার পাশে বসে। ও জানে দরিদ্র বাবা ওকে কলকাতায় পড়াতেই পাঠাতে পারত না। ঢাকা বোর্ডে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে পঞ্চম। সে জন্যই তো কুড়ি টাকার সরকারি বৃত্তি পাওয়া হল। আর সে জন্যই পদ্মা পার হয়ে বেথুন কলেজে পড়তে যাওয়া হল। তবে এটাও ঠিক এমন বাবা-মা না হলে ওর হয়তো পড়ালেখাই হত না।

বাবার বাম হাতটা কোলের ওপর উঠিয়ে নিয়ে ও বলে, ‘দাদা পড়াশোনা করে না বলে তুমি মন খারাপ কোরো না বাবা। সবাইকে দিয়ে যে সবকিছু হয় না, এ তোমার চাইতে কে আর ভালো বোঝে। আমি বিয়ে করব না। তোমাদের ছেড়ে অন্য বাড়িতে থাকতে পারব না আমি। তোমাদের দেখাশোনা আমিই করব।’

জগবন্ধু সোজা হয়ে বসে বলে, ‘না মা, তা হবে না। সমাজ বলতে একটা কথা আছে। তোমাকে বিয়ে দিচ্ছি না বলে আত্মীয়স্বজন পেছনে আমার মুন্ডুপাত করছে। কখনো মুখের ওপরও বাঁকা কথা বলতে ছাড়ে না। আমার মান-সম্মান থাকছে না। বলে, মেয়েদের এত লেখাপড়া করিয়ে কী হবে? সেই চুলোই তো ঠেলতে হবে।’

‘আহ্ বাবা, অন্যের কথায় কান দিও না। মানুষ তো মানুষের ভালো দেখতে পারে না। তোমার মেয়ের এত ভালো রেজাল্ট দেখে কতজনই তো মুখ বাঁকিয়েছে। তুমি এসব দেখেও দেখবে না বাবা।’

‘তা কি হয় রে মা, বাবা হয়ে আমিও তো তোর বিয়ে দিতে চাই। তোর মা-ও চায়।’

‘তুমি কি আমার কোষ্ঠীর কথা ভুলে গেছ বাবা?’

‘কোষ্ঠীতে কী আছে তা আমার দেখার দরকার নাই। আমি দুটো ছেলে দেখেছি। যেখানে তোর পছন্দ হবে, সেখানে এগোব। তুই আমাকে থামাতে পারবি না।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা ঘরে গিয়ে আলমারি থেকে নিজের কোষ্ঠী বের করে আনে। কাগজের পৃষ্ঠা খুলে, একুশ বছরে যে ওর ফাঁড়া আছে সেই পৃষ্ঠা বের করে। বাবার সামনে এনে মেলে ধরে বলে, 'দেখো এখানে কী লেখা আছে?'

'আমার দেখতে হবে না। যা লেখা আছে থাকুক। লেখাপড়া শিখে বাবা-মায়ের কথা শুনতে শিখিসনি দেখছি।'

'আমার একুশ বছর বয়সে একটা বড়ো ফাঁড়া আছে বাবা। তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? এই ফাঁড়াটায় হয় আমি মরে যাব, না হয় বিধবা হব। মরে গেলেতো গেলামই। আর বিধবা হলে, তোমার কাছে ফিরে আসতে হবে।'

'রানি!' প্রচণ্ড ধমকে চিৎকার করে ওঠে জগবন্ধু। 'তুই কোষ্ঠীর কি বুঝিস?'

'বাবা!' প্রীতিলতা কেঁদে ফেলে। 'তুমি দেখ এই জায়গাটা।' প্রীতি কোষ্ঠীর কাগজে লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে বাবার হাতে দেয়।

জগবন্ধু কাগজটা হাতে নিয়ে, লাল কালি দিয়ে দাগানো লাইনের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রন্দনরত মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলল, 'ঠিক আছে একুশ বছর পরেই না হয় বিয়ের চিন্তা করব। আর দেড় বছরের মাথায় তুই একুশে পড়বি।'

প্রীতিলতা চোখের জল মুছে ফিক করে হাসে। বাবা ওর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কি সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে! আর লোকে ওকে কালো মেয়ে বলে। জগবন্ধুকে বলে, মেয়ে তোমার আইবুড়োই থাকবে। এই মেয়েকে বিয়ে দিতে কাঠখড় সব বেচতে হবে।

পরদিনই কলকাতায় ফেরার জন্য ট্রেনে ওঠে ও। জানালায় মুখ রেখে দেখতে পায় বাবাকে। দাঁড়িয়ে আছে। প্লাটফরমের উপর ট্রেনের সঙ্গে দৌড়ে আসে শান্তি আর সন্তোষ। এক সময় ট্রেন চলে আসে বেশ দূরে। বাবাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। নিঃসঙ্গ। একাকী। মা যদি থাকত বাবার পাশে তাহলে ছবিটা পূর্ণ হত।

মায়ের কথা মনে করে প্রীতিলতা খোলা জানালার ওপর মুখ রাখে। সামনে প্রকৃতি। মাস্টারদার মতে, ওটা এখনো ওদের নয়। ইংরেজ শাসকদের তাড়ালে এই প্রকৃতি ওদের হবে। বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পাশে মা নেই বলে এ জন্যই ওর চোখে ছবিটা পূর্ণ হয় না। এটাও বিদেশি শাসক-শোষকদের নিজের দেশে অবস্থানের কারণে। ও বুকের ভেতরে উচ্চারিত করে, লং লিভ রিভলিউশন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আমি প্রীতিলতা। চট্টগ্রামের মেয়ে। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বেথুনে পড়ছি। সংবাদপত্রে পড়লাম আপনাকে আলিপুর জেলে আনা হয়েছে। তাই দেখা করতে এসেছি।’

প্রীতিলতা নিজের পরিচয় দিয়ে চুপ করে গেলেও রামকৃষ্ণ কথা বলতে পারে না। বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো গায়ের রঙের সঙ্গে দিঘল চোখের আলো ফুটিয়ে তোলা মেয়ে। দৃষ্টিতে কাঠিন্য। রামকৃষ্ণ বুঝতে পারে ও একজন বিপ্লবী। তবু মৃদু হেসে বলে, ‘মৃত্যুকুঠুরির আসামিকে দেখতে এসেছেন, ভয় করছে না?’

‘ভয়?’ হাসে প্রীতিলতা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ‘ভয় কাকে বলে জানি না। আপনি নিজে কি ভয় পান? ক্রেইগকে হত্যা করার জন্য যখন চাঁদপুরে গেলেন ভয় পেয়েছিলেন কি? কুমিল্লা জেল থেকে যখন এখানে এলেন তখনো ভয় পেয়েছিলেন কি? ভয় শব্দটি আপনার মুখে মানায় না। ওই শব্দ আমিও ব্যবহার করি না।’

‘বুঝেছি আপনি খুব সাহসী। কীভাবে এখানে এলেন?’

‘বোনের পরিচয় দিয়ে অনুমতি নিয়েছি। এদের খাতায় আমার নাম আরতি। সব ব্যবস্থা পিসিমা করেছেন।’

রামকৃষ্ণ ফিসফিসিয়ে বলে, ‘আপনিও যে বিপ্লবী জানতাম না।’

প্রীতিলতা নিচুকণ্ঠে বলে, ‘আমিও তো জানতাম না। না জানাটাই স্বাভাবিক। এই গোপনীয়তাটুকু রক্ষা করাই তো বিপ্লবীদের ধর্ম।’

‘ঠিক বলেছেন। আমাদের সামনে অনেক কাজ। আমাদের ব্যর্থতা আপনারা পুষিয়ে দিবেন। জয়ী আমরা হবই।’

প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে থাকে। অপরূপ সুঠাম দেহ, তারুণ্যে প্রদীপ্ত। কী অবিচল, কী নিষ্ঠা! প্রীতিলতা মুগ্ধ হয়ে যায়। মুগ্ধতা ওর সর্ব অবয়বে। রামকৃষ্ণ বুঝতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতাকে, পড়তে পারে ওর দৃষ্টি। রামকৃষ্ণর মন কেমন করে।

প্রীতিলতা বলে, 'আমি আপনাকে দেখতে এসেছি এবং একই সঙ্গে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতেও এসেছি। আপনি আমাকে কিছু কথা বলুন।'

'আমাদের সবার তো বলার কথা একটাই, প্রীতিলতা। আমাদের আরাধ্য কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব। আমাদের কোনো দুঃখবোধ নেই, আমাদের কোনো মৃত্যুভয় নেই।'

প্রীতিলতা মাথা নাড়ে, 'জানি। আপনার নিজের কথা বলুন?'

'বিপ্লবীদের তো নিজের কোনো কথা থাকে না।'

'এ-ও আমি জানি।' প্রীতিলতার কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা। 'ক্রেইগ হত্যার ঘটনাটা আমাকে বলবেন কি?'

রামকৃষ্ণ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'হ্যাঁ, বলাই উচিত। আমার অভিজ্ঞতা হয়তো আপনার কাজে লাগবে। আমার অভিজ্ঞতাটুকু আমি আপনার কাছেই রেখে যেতে চাই।'

প্রীতিলতা পলকহীন তাকিয়ে থাকে। আমার কাছে! ও মনে মনে উচ্চারণ করে। এই মুহূর্তে আমিই আপনার কাছে আছি। আমি চাই না এই মুহূর্তে আর কেউ আপনার কাছে থাকুক। আমি একাই সবকথা শুনব। একজনের অভিজ্ঞতা অন্যজনকে সহায়তা করে। তাহলে কি আমরা পরস্পরের পরিপূরক? আমি এবং রামকৃষ্ণ? আমরা কি একে অন্যের? ওহ্, কি গভীর প্রত্যাশা! ও ঔৎসুক্য নিয়ে রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে থাকে। গায়ের কালো রঙের সঙ্গে সুঠাম শরীরের সৌন্দর্যে স্নিগ্ধতা নেই, মাদকতা আছে। প্রীতিলতা নিজেকে শাসন করে। মনে মনে বলে, আমি একজন নারী। পরক্ষণে প্রশ্ন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, বিপ্লবী বলে আমি নারী হব না কেন? আমার কি কাউকে ভালো লাগতে পারে না? এই একটি জায়গায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে প্রবল আপত্তি ছিল ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেন্ট মাস্টারদা সূর্য সেনের। তিনি নিজেও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। মেয়েদের পলাতক হওয়ার নির্দেশ দেননি। পার্টির নির্দেশ ছিল, মেয়েদের কাছ থেকে ছেলেদের দূরে রাখা। প্রীতিলতা নিজেকেই জিজ্ঞেস করে, আমি কেমন করে এই কঠিন শর্ত মানব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তখন রামকৃষ্ণের কণ্ঠ স্পর্শ করে ওর হৃদয়। রামকৃষ্ণ কথা বলছে, 'সেদিন মাস্টারদা আমাদের কী কথা বলেছিলেন তা শুনুন। আমরা তখন কর্ণফুলি নদীর ওপারে শ্রীঘর গ্রামে পলাতক। তিনি আমাদের ডাকলেন। বললেন, "খবর পেয়েছি বাংলার পুলিশ প্রধান নিহত লোম্যানের স্থলাভিষিক্ত মি টি জি ক্রেইগ কোনো একটা তদন্তের ব্যাপারে চট্টগ্রামে এসেছে। সে দু-একদিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে যাবে। আমরা চাই, ফিরে যাওয়ার পথেই ক্রেইগকে শুধু বাংলার মাটি থেকে নয়, পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।"

'আমরা দশ-বারো জন পলাতক সদস্য ছিলাম। আমরা সবাই এই সিদ্ধান্তে একযোগে সমর্থন জানাই। মাস্টারদা বলেন, "আগস্ট মাসে বিনয় বসুর গুলিতে লোম্যান মরেছে। এখন তার জায়গায় ক্রেইগ নামে যে ইংরেজটা বসেছে, তাকে যদি অচিরেই সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে তাতে বাংলার ব্রিটিশ মহলে এক ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলনে জাগবে নতুন প্রেরণা। তিন মাসের মধ্যে আরো একজন পুলিশ প্রধান নিহত হলে, এক বিভীষিকার রাজত্ব বলে তাদের কলিজার রক্ত যাবে শুকিয়ে, ত্রাসে বুকটা কাঁপতে থাকবে তাদের। ঔপনিবেশিক আরামপূর্ণ জীবনে হলাহল পড়বে ঝরে ঝরে। কোটি কোটি লোকের রক্তে গড়া ঔপনিবেশিক স্তম্ভগুলো ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে পড়বে। লোম্যান গেছে, ক্রেইগ যাবে, তারপর আরো অনেককেই জীবন দিয়ে মৃত্যু-পরওয়ানার জবাবদিহি করতে হবে।" এরপর মাস্টারদা আমার এবং কালীপদের ওপর ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। ঠিক হয় আমরা ওই দিন রাতেই রওনা দেব।

'তখন রাত বারোটা। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শীতের রাত। কুয়াশা অন্ধকারকে আরো জমাট করে তুলেছে। খুব কাছের মানুষকেও দেখা যায় না। আমরা দুজনে দুটো রিভলবার কোমরে বেঁধে নিলাম। বোমা দুটো ভরে নিলাম পকেটে। নাইট্রোগ্লিসারিন পাউডার দিয়ে তৈরি অ্যালুমিনিয়াম সেলে পূর্ণ করা বোমা। সঙ্গে ওয়েভলি রিভলবার। দায়িত্বটি পেয়ে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। মনে হল পৃথিবীর কোনো কিছুতে আমার আর কোনো ভয় নেই। মাস্টারদা বললেন, "বোমার চেয়ে রিভলবারের দিকে জোর দেবে, কারণ রিভলবার শট নিশানা রাখতে অনেকখানি নিশ্চিত। বোমা ব্যবহার করবে কেবল শেষ অস্ত্র হিসেবে, যদি অকুস্থলে অনেক লোক জড়ো হয়ে যায় এবং কোনোভাবেই কাছে ঘেঁষা যাচ্ছে না বলে মনে হয়। এহেন অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কেবল বোমা ব্যবহার করবে। এতে নিশানা বা লক্ষ্যবস্তুর গায়ে আঁচড় নাও লাগতে পারে। বোমার আঘাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে হয়তো শেষে রিভলবার নিয়ে ধাওয়া করে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবে।”

‘কাজের আরও ছোটোখাটো দিকগুলো আমাদের বুঝিয়ে দিলেন মাস্টারদা। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বেরুলাম। সঙ্গে মাস্টারদা এবং অন্য বন্ধুরা খানিকটুকু এলেন আমাদের বিদায় জানাতে। কী নিঃশব্দ পদক্ষেপ আমাদের সবার! পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দটুকু ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। ঝিঁঝির ডাক নেই, জোনাকিও জ্বলেনি। সেই বাড়ির উত্তর ধারের এক পুকুরপাড় দিয়ে পায়ে-চলা পথ। সেখানকার এক আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে মাস্টারদা বললেন, “না মেরে ফিরে আসবে না।” শিউরে উঠল সমস্ত শরীর। প্রবল ঝাঁকুনিতে নিজেকে আত্মস্থ করলাম। বন্ধুরা বিদায় জানাল। কয়েক মুহূর্ত এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, এ যেন শেষ বিদায় না হয়। যেন গৌরব নিয়ে ফিরে আসতে পারি।

‘পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কর্ণফুলি। কলকল শব্দে দুকূলে আছড়ে পড়ছে জল। যেন গভীর ভয়ানক কোনো শব্দ চরাচর পরিব্যাপ্ত করে ছুটে আসছে। এ আমার চিরচেনা কর্ণফুলি নয়। এ আমার বুকের মধ্যে এক তুমুল তোলপাড়। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার উত্তেজনায় আমি তখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম। শচীন ছিল আমাদের গাইড। সাম্পান ঠিক করা ছিল। শচীনের সঙ্গে আমরা সাম্পানে উঠলাম। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছি না। জলের শব্দ ছাড়া শব্দ নেই। দূর আকাশে নক্ষত্র। কর্ণফুলির দুপাড়ে ঘন বৃক্ষরাজি। সে অনুভূতির কথা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এই আমার দেশ, একে আমি স্বাধীন দেখতে চাই। ‘এখানে বিদেশিদের কোনো জায়গা নেই। এই অন্ধকার রাত আমার একান্ত নিজস্ব — এখানে আমি ইচ্ছে করলেই বৃক্ষরাজির শাখার ওপর নক্ষত্রের ফুল ফোটাতে পারি। বিদেশির অধিকার নেই আমার দেশের সাম্পান মাঝির বুকের ওপর উঠে দাঁড়ানোর। কী ওর অপরাধ ছিল? অপরাধ, সাহেবের সুটকেসে কাদা লেগেছিল। যতক্ষণ না সেই মাঝির নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল, ততক্ষণ ওর বুকের ওপর দাঁড়িয়েছিল বিদেশি বেনিয়া কুত্তা। ওরা কে, যে আমার দেশের মানুষকে মারবে? আমিও অমন ফিনকি দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসা রক্ত দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চেয়েছি।

‘শুধু কি তাই? অন্ধকারের বুক চিরে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আগুনের শিখা। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে নিহত নয়জন শহিদকে ওরা পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই মৃতের শেষ আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে ওরা। আমি প্রতিশোধ চাই। অর্ধ-দগ্ধ অর্ধেন্দু পাহাড়ের মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। বেনিয়াগুলো অর্ধেন্দুকে নিয়ে আসে হাসপাতালে। চিকিৎসার জন্য নয়, এনেছে অর্ধেন্দুর কাছ থেকে গোপন খবর আদায় করবার জন্য। কিন্তু একজন বিপ্লবীর মুখ থেকে গোপন খবর আদায় করা কি এতই সহজ? ও বলেছে, “চিকিৎসা আমি চাই না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও তোমরা।” অর্ধেন্দু ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে ওদের সমস্ত প্রশ্ন।

‘আমি এই ঘৃণা বুকে পুষে রাখতে চাই। আমৃত্যু আমি এই ঘৃণা বুকে পুষে রাখব। কী করে যে অন্ধকারে ভয়ানক একটি নদী পেরিয়ে এলাম, বলতেই পারব না। বুকের ভেতর গর্জন, নদীর মধ্যে গর্জন, আকাশে নক্ষত্ররাজির গর্জন — সে গর্জন শুনতে পাই না আমরা। বৃক্ষপত্র পতনের শব্দ, সেটাও তো গর্জন। আমি গর্জন ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না তখন। শেষরাতে একটু ঝিমুনি এসেছিল। রাত প্রায় চারটার দিকে শচীন আমাদের ডাকল। ওর নির্দেশে আমরা বাকলিয়ায় নামলাম। এবার পায়ে-হাঁটা পথ। কিছুটা হেঁটে সড়কে উঠলাম। অন্ধকার হালকা হয়ে এসেছে। কনকনে বাতাস নাকেমুখে ঢুকে যায়। আমি একটা লাল রঙের চাদর দিয়ে মুড়িয়ে নিয়েছি নিজেকে। কালীপদের গায়ে নীলরঙের চাদর। শিশিরে পায়ের পাতা ভিজে যায়। ফসল-শূন্য মাঠ কুয়াশায় ধোঁয়াটে হয়ে আছে। আমার খুব ভালো লাগছিল সেই পথে হাঁটতে। মনে হচ্ছিল, আট বছরের বালক হয়ে মাঠ জুড়ে ডিগবাজি খাই অনবরত। আমার হাতে পিস্তল এবং বোমা। আমি তো এই দেশের স্বাধীনতা নিজের হাতের মুঠোয় নিতে পারি।

‘গ্রামের ঝোপঝাড়, বাঁশবন, আঁকাবাঁকা পথে শহরের উত্তর ধারে কাতালগঞ্জে এলাম আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। আমার কলেজের সহপাঠী সরোজের বাড়ি। ওর কাছে আমাদের আসার খবর দেওয়া ছিল। নাম ধরে ডাকতেই দরোজা খুলে বেরিয়ে এল এবং দোতলায় নিয়ে গেল। ঘরে পাটি বিছানো ছিল। আমরা শুয়ে পড়লাম। কারণ, অপারেশনের আগে আমাদের খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। কিন্তু মাথা কি ঠান্ডা রাখা যায়? নাকি ঘুম আসে? মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মধ্যে হাজার চিন্তা বুদ্বুদের মতো উঠছে আর গড়াচ্ছে। আমি উসখুস করি। কালীপদ চোখ বুজে শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে কিনা বুঝি না। ও কিছুটা ধ্যানস্থ, একাগ্র হবার চেষ্টা করছে। কালীপদ বরাবরই শান্ত, ধীরস্থির। আমি অত শান্ত থাকতে পারি না। সবসময় মাথার ভেতরে ঘূর্ণি ওঠে। তবু জোর করে ঘুমুতে চেষ্টা করলাম।

'সকাল আটটায় আমাদের আর এক বন্ধু অর্ধেন্দু গুহ এল। ওর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। ঠিক হয় ক্রেইগের চেহারা কেমন, কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তা ঠিকভাবে জানার জন্য এবং তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য কোতোয়ালি, ডিআইবি অফিস, পুলিশ লাইন ও স্টেশনে আমাদের পক্ষ থেকে সতর্ক পাহারা রাখার ব্যবস্থা করা হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, বিকেল চারটায় আমরা দুজন মোটরগাড়িতে করে কুমিরা স্টেশনে চলে যাব। সেই স্টেশনে ক্রেইগের খবরাখবর নিয়ে আমাদের কেউ চলে আসবে। এটাও ঠিক হয় যে, ক্রেইগের কোনো খোঁজ পাওয়া না গেলেও খবরদানকারী ব্যক্তি স্টেশনে অবশ্যই আসবে। যেন ভুল না করে। কারণ, তার দেওয়া খবরের ওপরই আমাদের পরবর্তী কাজগুলো নির্ভর করবে। অবশ্য একথাও বলা হয় যে, সম্ভব হলে যেন ক্রেইগের কেবিনের দরজার চাবি জোগাড় করার চেষ্টা করা হয়। আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব। দরকার হলে কেবিনের দরজা খুলে তাকে হত্যা করব। 'হত্যা' শব্দটি তখন কী এক অসাধারণ শব্দ আমার কাছে। এই একটি শব্দের জন্য বাজি ধরতে পারি সমস্ত জীবন।

'আলোচনায় আরো ঠিক হয়, কুমিরা স্টেশন থেকে আমরা সীতাকুন্ড ও কলকাতার টিকিট কাটব। যদি কোনো কারণে ক্রেইগের কোনো খবর পাওয়া না যায় তা হলে আমরা সীতাকুণ্ড স্টেশনে নেমে আবার কুমিরায় ফিরে আসব। পরদিনও আমরা আবার টিকিট কেটে ক্রেইগের আসার অপেক্ষায় থাকব। তারপরও যদি কোনো খবর পাওয়া না যায়, তা হলে আমাদের পলাতক আস্তানায় ফিরে আসব। এ সিদ্ধান্তে আসতেই 'না' শব্দে আর্তনাদ করে উঠলাম। বললাম, ফিরে আসতে চাই না। না মেরে ফিরে আসব না।

'ওরা দুজন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, "ধৈর্য ধর বন্ধু। যা করি ঠিকভাবে যেন করতে পারি। ভুল যেন না হয়।"

'তা সত্যি, ভেবে চুপ করে রইলাম। আমরা লুকিয়ে ছিলাম বলে সেই ভোরে কিছুই খাওয়া হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

না। দুপুর পর্যন্ত উপোস। দুপুরেও খাওয়া হল না। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিরুপায়। সরোজ খাবারের ব্যবস্থা করতে পারল না। ঠিক চারটের সময় আমাদের জন্য ভাড়া করা মোটর গাড়ি এল। দুজনে কোট গায়ে দিয়ে, তার ওপর লাল ও নীল র□্যাপার জড়িয়ে নিলাম। র□্যাপারের নীচে কোটের তলায় রিভলবার মুঠি করে ধরে আছি। শিউরে ওঠে শরীর, উত্তেজনা এবং অজানা আশঙ্কায়। নানা কিছু মনের ভেতর ভিড় জমায়। গাড়ি চলতে শুরু করে। পেরিয়ে যায় লোকালয়, প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত করা সবুজ। পেছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করে রাখি। নিজেকে বুঝতে চাই। নিজের শ্বাস উপলব্ধি করতে চাই। প্রাণভরে শ্বাস নিলে বাবা-মা-ভাইবোনের কথা মনে পড়ে। প্রিয়জনদের ছেড়ে যাচ্ছি। জানি না ওদের সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে কি না! ওরাও জানে না আমি কোথায় — কোথায় আমার গন্তব্য? মা কি ভাত নিয়ে অপেক্ষা করবে? রাত বাড়বে, ঘরের চালে বাদাম গাছ থেকে লাল পাতা ঝরবে, শিশির জমবে পাতায়, মার ঘুম পাবে। তবু মা জেগে থাকবে অনেক রাত পর্যন্ত। এক সময় নিজেই বলবে, না, আজ রাতে বুঝি আর এল না, বাউন্ডুলে ছেলেটা আমার। মার কথা ভাবতেই গলার কাছটা ধরে আসে আমার। খুব কষ্টে নিজেকে সামলাই। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কুমিরা বাজারে মোটর গাড়ি থেকে নামলাম। ধীরে-সুস্থে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। কিছু খাওয়া দরকার। আমরা কেউই কথা বলছিলাম না। কালীপদ বয়সে আমার বড়ো। তবু আমি ওকে নাম ধরেই ডাকতাম। বললাম, কী হল চুপচাপ যে?

‘কালীপদ ঝটপট জবাব দিল, “কাজের আগে বেশি কথা বলতে নেই। বেশি কথা বললে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়।”

“বাবা! তুমি দেখছি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছ।”

‘ও জবাব না দিয়ে এক গ্লাস জল খায়। ওর চেহারায় কৈশোরের আদল, গোঁফ ওঠেনি। আমি ওর চেয়ে লম্বা চওড়া বলে আমাকে দেখতে বড়ো দেখায়। তাই প্রায়ই আমি ওর সঙ্গে বড়ো ভাইয়ের মতো আচরণ করতাম। কালীপদ কিছু মনে করত না। আজ ওকে গম্ভীর দেখে আমার বয়স্ক-বয়স্ক মনে হচ্ছিল। চা আর ডালপুরি খাই আমরা। বেশ কড়া চা। পরপর দু-কাপ খেয়ে ফেলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

“তুমি আর চা খাবে নাকি কালীপদ?”

“না। আমার হয়ে গেছে।”

“তেমন কিছুই তো খেলে না?”

“ভালো লাগছে না।”

“টেনশন?”

কালীপদ মৃদু হাসে, “ওই শব্দটি আমি বুঝি না।”

“ঠিক বলেছ, আমিও না। আমার খুব ফুর্তি লাগছে।”

“দেখ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।”

‘কালীপদ একইভাবে গম্ভীর হয়ে বাইরে তাকায়। কেমন নির্জন হয়ে গেছে চারদিক। বেশির ভাগ লোকই ঘরে ফিরে গেছে। আমরা দোকানের পয়সা মিটিয়ে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে আসি। দরজার সামনে দোকানদার জিজ্ঞেস করে, “আপনারা কোথায় যাবেন?” কালীপদ ঝট করে বলে, “কলকাতায়।”

“ও, ট্রেন তো একটু পরেই এসে যাবে। যা শীত পড়েছে।”

‘আমরা মাথা নেড়ে দ্রুত বেরিয়ে আসি। আমাদের গায়ে কোটের ওপর র□্যাপার। ঠান্ডা তেমন লাগছে না। স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম ট্রেন আসার অনেক বাকি। রাত ন-টার আগে আসবে না। টিকিট কাটতে গিয়ে দেখলাম, আর এক ঝামেলা। ছোটো স্টেশন বলে এখান থেকে কলকাতার টিকিট বিক্রি হয় না। সুতরাং লাকসামের টিকিট কাটলাম।’

এতটুকু বলেই রামকৃষ্ণ চুপ করে গেল।

নিম্নস্বরে কথা বলতে হচ্ছে বলে কণ্ঠে চাপ পড়ছে। বারবার কাশি আসছে। ও হাতের তালুর আড়ালে কেশে নেয়। প্রীতিলতা পলকহীন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন গল্প কি ও কখনো শুনেছে? এবং এমন একজন মানুষের কাছ থেকে? যে মানুষের মাথা আকাশ-সমান উঁচু, যার পা মাটির শেষ স্তরে প্রোথিত, যাকে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয় কিংবা দ্বিখন্ডিত করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কাশতে কাশতে রামকৃষ্ণের চোখে জল আসে। ওর এলোমেলো অবিন্যস্ত চুলে হাত রাখতে বড়ো বেশি ইচ্ছে করে প্রীতিলতার। শুধু একটুখানি মমতার স্পর্শ। কিন্তু কেমন করে সম্ভব? রামকৃষ্ণের কেশ স্পর্শ ক্রেইগ-হত্যার চাইতেও কঠিন কাজ। প্রীতিলতার হাত কুঁকড়ে থাকে।

তখন সেপাই এসে দাঁড়ায় ওদের কাছে। বলে, 'আপনারা আর কথা বলবেন না। সময় হয়ে গেছে।'

'সময় হয়ে গেছে?'

প্রীতিলতা বিস্ময়ে সেপাইয়ের দিকে তাকায়। তারপর রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সময় শুরুই বা হল কখন, শেষই বা হল কখন?'

রামকৃষ্ণ হেসে বলে, 'কখনো এমনই মনে হয়। আজ থাক।'

'বাকিটুকু? আমাকে তো সবটুকুই শুনতে হবে।'

'আরতি আরো কি দেখা হবে?'

'হবে। আমি আবার আসব।' প্রীতিলতা দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

'আর না আসাই উচিত।'

'মানা করছেন?'

'হ্যাঁ। বোঝেন না?'

প্রীতিলতা আর একটি কথাও বলে না। গভীর চোখে রামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে দৃষ্টি ফেলে। সেই ভাষা বুঝতে পারে রামকৃষ্ণ এবং এ-ও বোঝে যে, শব্দের ভাষার চেয়ে এই দৃষ্টির ভাষা আরো কঠিন। শব্দে এই ভাষার প্রকাশ হয় না। রামকৃষ্ণ দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। প্রীতিলতা নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। রামকৃষ্ণ বুঝতে পারে যে, প্রীতিলতা আবার আসবে। ও ভিন্ন ধরনের মেয়ে। ওর মধ্যে যেমন প্রবল সাহস আছে, তেমনি প্রচণ্ড আবেগ আছে। ও পিছিয়ে পড়ার মেয়ে নয়। রামকৃষ্ণের বুক ফুঁড়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মনে মনে বলে, প্রীতিলতা ভুল করছে। আমার তো ওকে কিছু দেওয়ার নেই। কিন্তু আমি ওকে কী করে ফেরাব? ফেরাব কেন? আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কি ওকে ভালোবাসা দিতে পারি না? যতদিন বাঁচি বা যেটুকু সময় বাঁচি, সে সময়টুকুকেই তো অনন্তকাল করতে পারি? ভালোবাসার জন্য তো দীর্ঘ জীবনের দরকার হয় না।

রামকৃষ্ণ ধীরপায়ে হেঁটে যায় সেলের দিকে। মনে মনে বলে, প্রীতিলতার সঙ্গের এই কয়েকটি দিনকেই আমি একটি সমগ্রজীবন করে তুলব।

ও পেছন ফিরে তাকায়। সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিমান প্রহরী। ওর দৃষ্টি প্রীতিলতার কাছাকাছি বসে-থাকা সবটুকু জায়গা ছুঁয়ে আসে। ও বুকে ফুঁ দিয়ে বলে, 'লং লিভ রিভলিউশন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

৫

হস্টেলে ফিরে প্রীতিলতা অস্থির হয়ে থাকে। ও ঘরে পায়চারি করতে করতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। লম্বা বারান্দায় হাঁটতে ও অস্বস্তি বোধ করে। সুনন্দা ওকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, 'তোর কী হয়েছে প্রীতি?'

'কিছু না।'

'এমন অস্থিরভাবে পায়চারি করছিস যে?'

'দর্শনের ছাত্রীরা এভাবেই পায়চারি করে।'

'আগে তো করিসনি? তখনো তো তুই দর্শনের ছাত্রী ছিলি। বল ছিলি না? নাকি নতুন করে দর্শন বিভাগে ভর্তি হয়েছিস?'

সুনন্দা হাসতে হাসতে বলে, 'জানি তো তোর কাছে উত্তর নেই। তার চেয়ে বল আমি কীভাবে পায়চারি করছি তা দেখার তোর দরকার কী? বল প্রীতি, বলেই দেখ একবার।'

প্রীতিলতা উত্তর না দিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে বাগানে চলে আসে। কখনো মানুষের চাইতে প্রকৃতি অনেক বড়ো বন্ধু। প্রীতিলতার এখন তেমন সময়। ও কাঠগোলাপ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে। সাদা ফুল বিছিয়ে আছে চারদিকে। মনে মনে বলে, ও আমাকে নিষেধ করেছে যেতে? কেন করবে? কেন? ও কুচিকুচি করে ফুলের পাপড়ি ছেঁড়ে। আমিও জানি একজন বিপ্লবীর সাবধান থাকা উচিত। মৃত্যুকুঠুরির আসামিকে ঘন ঘন দেখতে যাওয়া উচিত নয়। চারদিকে বিপদ। একজন ধরা পড়লে, অনেকের ক্ষতি হতে পারে। তাই ও আমাকে নিষেধ করেছে। বলেছে, বোঝেন না? হ্যাঁ বুঝি। কোটি কোটি বার বুঝি। তারপরও আমি বুঝতে চাই না। বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি রামকৃষ্ণকে জানতে চাই। শুনতে চাই ওর হৃৎপিন্ডের ধুকপুক ধ্বনি, অনুভব করতে চাই বুকের ঝড়, জানতে চাই দীপ্ত দৃষ্টির অন্তরালে কী ঘন কালো মেঘ জমে আছে? রামকৃষ্ণ আমার আবিষ্কার এবং শেষ ঠিকানা, যেমন এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

স্বদেশ, যেমন এই বিপ্লবী হয়ে দিনযাপন এবং একদিন সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়া। সবকিছুই তো আমার নিয়তি। তবে কেন রামকৃষ্ণ আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে? কী অপরূপ সুঠাম দেহ, কী বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, সতেজ ও। বিচারকের রায় ওকে ম্লান করতে পারেনি। রামকৃষ্ণের দৃঢ়তা আমার অনুপ্রেরণা, ওর অভিজ্ঞতা আমারই অভিজ্ঞতা, আমি ওর মতো জীবন বাজি রেখে হেঁটে যাব মাইলের পর মাইল।

অস্থিরতা প্রীতিলতাকে আবার ব্যাপৃত করে। ও বাগানে পায়চারি করে। আবার ফিরে আসে কাঠগোলাপ গাছের কাছে। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। গাছ থেকে লাল পিঁপড়ে নেমে আসে। ওর ঘাড়ে কুট করে কাটে। ও টের পায় না। ও নিজের ভিতর দারুণ মগ্ন। বিকেলের শেষ আলো বাগানের গাছের ওপর। ও নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। দেখে লাল হয়ে আছে মেঘ। আকাশে মেঘের নকশা, সে নকশার ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত আলোর ছটা। নকশাগুলো ঝুলে আছে এক অসীম অন্তহীন পটভূমিতে। প্রীতিলতার মনে হয়, এই সব দৃশ্য মানুষকে দার্শনিক করে। দর্শন কী? দর্শন আলো এবং ছায়া — করোটির গভীরতম প্রদেশে চেতনার বিস্তার। এই বিস্তার মানুষ অর্জন করে দীর্ঘকালের সাধনায়। আস্তে আস্তে প্রীতিলতার অস্থিরতা কমে যায়। ও নিজের ভেতরে সমাহিত হয়। ধীর পায়ে বাগান ছাড়িয়ে ঘরে আসে। স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানায়। মমতা জিজ্ঞেস করে, 'কীরে এমন গম্ভীর চুপচাপ যে?'

'মাথা ধরেছে। ভালো লাগছে না।'

'তোকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।'

'আহ্ মমতা, বেশি কথা ভালো লাগছে না।'

'ঠিক আছে বাবা, চুপ করলাম। আমাকেও এক কাপ চা দিস।'

প্রীতিলতা হেসে বলে, 'না চাইলেও দিতাম। তুই কি ভেবেছিস তোর সামনে বসে আমি চা একা খাব?'

'আজ ক্লাসে ম্যাডাম তোকে খুঁজেছিলেন।'

প্রীতিলতা সে প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। মমতার টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলে, 'বল তো এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পরাধীন মাটিতে কান্ট, হেগেল দিয়ে কী হয়? তাদের আমি তখনই আপন ভাবতে পারব, যখন দেখব, আমি একজন মুক্ত মানুষ।'

'কী যে বলিস না? চারদিকে যা শুরু হয়েছে। তুই কি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিস না কি?'

'পাগল। দর্শনের চিন্তাই কুলিয়ে উঠতে পারছি না। তা আবার বিপ্লব! যাই ছাদে গিয়ে চা খেয়ে আসি।'

'শোন প্রীতি, তোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুই খুব অস্থির।'

'অস্থির হতেও পারি। অস্থির সময়ের অস্থিরতা আমাকেও পেয়ে বসবে, এটাই তো ঠিক। নাকি?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। সুযোগ পেলে আমিও বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়াব। কাজ করতে চাই।'

'সত্যি? তাহলে চায়ের কাপ নিয়ে ছাদে চল।'

'না, পড়তে বসতে হবে। আমার আবার কাল টিউটোরিয়াল পরীক্ষা। কিছুই মুখস্থ করতে পারিনি।'

'ঠিক আছে তুই পড়। আমি ঘুরে আসি।'

'তোর টিউটোরিয়াল পরীক্ষা দিয়েছিস?'

'পরীক্ষা দিয়ে কী হবে? নোট মুখস্থ আর পাস করা? ফুঃ।'

'এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হয়ে তোর মুখে এই কথা?'

প্রীতিলতা চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে যায়। ছাদে আসে। আকাশে মেঘ নেই। গাঢ় কুয়াশা। অজস্র তারা জ্বলজ্বল করছে। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই বুকটা ছলকে ওঠে। যেন শুনতে পায় রামকৃষ্ণের কণ্ঠ, প্রীতি আমাকে কি এক কাপ চা দেবে? প্রীতিলতার আর চা খাওয়া হয় না। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতর রামকৃষ্ণের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে — প্রীতি, কপালে হাত দিয়ে দেখ না, জ্বরটা বাড়ল কি না! যেন দুজনের ঘরগেরস্থি, প্রীতিকে ছাড়া রামকৃষ্ণের কিছুই চলে না। ও চায়ের কাপ নীচে নামিয়ে রাখে। নিজের অবচেতনে কী প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এসব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। অন্য কিছু ভাবতে চায়, তবু অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ও রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই শহরে পড়তে এলেও শহরের সঙ্গে ওর তেমন আন্তরিকতা গড়ে ওঠেনি। কেবলই চট্টগ্রামের কথা মনে হয়। ওই পাহাড়ি এলাকাটা ওর স্বপ্ন — সেখানেই ওর স্বাচ্ছন্দ্য। মুহূর্তের মধ্যে অর্ধেন্দুর জন্য বুক ফেটে যায়। অর্ধেন্দু চিৎ হয়ে পড়ে ছিল, ঝলসে যাওয়া শরীর — ওর দূর সম্পর্কের ভাই। মৃত্যু অবধারিত জেনেই তো ওরা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটছে। রামকৃষ্ণ গাঢ়স্বরে উচ্চারণ করেছে অর্ধেন্দুর কথা। অর্ধেন্দুদাদা যেন ওর সামনে এক পবিত্র গ্রন্থ — ইচ্ছে করলেও ছুঁতে পারে না। ছোঁয়া যায় না। ছুঁতে হলে চাই নিজেকে বিশুদ্ধ করা। এই বিশুদ্ধতা ক-জনই বা অর্জন করতে পারে? প্রীতিলতা নিজেই কি পেরেছে? এখনো তো অনেক সাধনা বাকি। বাকি অনেক ধ্যানমগ্নতা।

প্রীতিলতা রেলিংয়ে মাথা ঠোকে এবং শেষে শান্ত হয়ে অর্ধেন্দুর জন্য প্রার্থনা করে। পাহাড়ের নিসর্গে চিৎ হয়ে শুয়ে জ্বলজ্বল নক্ষত্র দেখেছিল অর্ধেন্দু। এখন ও নিজেই একটা বিশাল নক্ষত্র। এভাবেই কি ওরা সবাই নক্ষত্র হয়ে যাবে? তারপর কি স্বাধীনতা? এই রক্তের গল্পই তো বলে যায় রামকৃষ্ণ। কী গাঢ়স্বরে উচ্চারণ করে, কী আবেগ থাকে সে কণ্ঠে! রামকৃষ্ণের চেতনায় বিদ্রোহ এবং ভালোবাসা। রামকৃষ্ণ ওর গল্প শপথের মতো উচ্চারণ করে। আর একজন বিপ্লবীর কানে তা বাণীর মতো ধ্বনিত হয়। প্রীতিলতার হৃদয় জুড়ে সেই কণ্ঠের অনুরণন।

তখন ও ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা একচুমুকে খেয়ে ফেলে। প্রচন্ড ভালোলাগা ওকে আচ্ছন্ন করে। তখন ও বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলে — এখন আমার জীবনের বড়ো দর্শন দেশমাতৃকার স্বাধীনতা এবং একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে ভালোবাসা। আমি রামকৃষ্ণকে ভালোবাসি। এই মুহূর্তে আমার বড়ো দর্শন, মৃত্যু এবং ভালোবাসার বন্ধন রচনা। আমি প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, বেথুনের ছাত্রী, নিবাস চট্টগ্রাম। পুথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়ে, কান্ট-হেগেল ছাড়িয়ে নিজের দর্শন অর্জন করতে পেরেছি। আমি যা করছি এটাই সত্য। আমার জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে কোনো তফাত নেই। আমি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে ভালোবাসি।

ভাবতেই ওর সমস্ত শরীরে মৃদু কম্পন বয়ে যায়। ও দুহাতে রেলিং আঁকড়ে ধরে। তীব্রভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কৈশোরের কথা মনে পড়ে। যখন ও ড খাস্তগীর স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী তখনই তো ঘটেছিল সেই ঘটনা। সূর্য সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তীকে রেলওয়ের টাকা ডাকাতির অপরাধে গোরুর গাড়ির ওপর বসিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। রানুদের বাসার জানালায় দাঁড়িয়ে ও এ-ঘটনা দেখেছিল। কই ভুলতে তো পারেনি? পুলিশের এক হাবিলদার ওদের মাঝে মাঝে লাথি-ঘুষি দিচ্ছিল আর বলছিল 'বোল্ শালা, নাম বোল্।' দুজনেই মারের চোটে এলিয়ে পড়ে, কিন্তু একটি কথাও বলে না। একজনের গায়ে এন্ডির চাদর, ক্ষীণ শরীর, হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। অন্যজন বয়সে তরুণ, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, ডান পায়ের আহত স্থান চেপে ধরে বসে আছে। পাশ থেকে মনু চেঁচিয়ে বলেছিল — 'ওই যে উনি চাদর গায় দিয়ে বসে আছেন, তিনি আমাদের অঙ্কের মাস্টার। তাঁকে কেন এমন করে নিয়ে আসছে? মাস্টার কি কখনো ডাকাত হয়?'

'তাঁর নাম কী রে?'

'সূর্য সেন।'

সেই তো কৈশোরে দেখা শুরু। এখনো শেষ হয়নি। অনেক পরে জেনেছিল, ওরা স্বদেশি ডাকাত। চট্টগ্রাম কোর্টে মামলা শুরু হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর হয়ে লড়তে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। প্রতিদিন কত লোক ওই মামলা দেখার জন্য জড়ো হত কোর্টে। ওর ভীষণ ইচ্ছে করত যেতে। কিন্তু উপায় ছিল না। ও কী করে যাবে? ও যে মেয়ে। ওর তো কোর্টে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আর ওকে কেইবা নিয়ে যাবে? সমাজ সংসারের সবকিছুতো এত সহজ না!

বেদনায় মুষড়ে যেত প্রীতিলতা। কৈশোরের ওই উপলব্ধিকে ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়। একদিন খবর পায়, রেলওয়ের ডাকাতির মামলায় বেকসুর খালাস হয়ে যায় সূর্য সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী। এই ঘটনার পর স্কুলের শিক্ষয়িত্রী উষাদি বলেছিলেন, ওদের কোনো অপরাধ নেই। ওরা নিজেদের টাকা নিজেরাই নিয়েছে। যারা বিচার করছে, তারাই অন্যায়ভাবে আমাদের টাকা নিচ্ছে। কিন্তু ওদের বিচার করবে কে? আমরাই ওদের বিচার করব। আর তাই চাই স্বাধীনতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

গভীর মনোযোগে উষাদির কথা শুনেছিল প্রীতিলতা। স্বাধীনতা? শব্দটি ওর বুকে গেঁথে যায়। অন্যায়গুলোও বোঝার চেষ্টা শুরু করে। ওর মনে হয়, ওর শৈশবে দেখা মণীশকাকা এবং কৈশোরের সূর্য সেনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্রের জন্যই ওরা আজ স্বদেশি। উষাদির কথা শুনতে শুনতে ওর ক্ষুদিরামের কথা মনে হয়। বাউলের মুখে শোনা সেই বিখ্যাত গান, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' কত অল্প বয়সে মানুষটি হাসতে হাসতে দেশের জন্য মরে গেল। ভাবলেই প্রীতিলতার চোখ ছলছল করে ওঠে। গলার কাছে কান্নার দলা চেপে থাকে। তখন ওর মনে হয়, সুবলদাদা ওকে যে বইগুলো দিয়েছে, তার মধ্যে ক্ষুদিরামের জীবনী আছে। আজই গিয়ে সেটি পড়বে। উষাদি ওকে দিয়েছে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের জীবনী। উষাদি বলেছে, আমাদের দেশের ইতিহাস তোমাদের পাঠ্যবইয়ে লেখা থাকে না। ইংরেজ সরকার আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। কিন্তু তোমাদের উচিত, দেশের সত্যিকার ইতিহাস জানা। তোমরা এইসব বই পড়বে। আমি তোমাদেরকে আরো বই দেব। আমি চাই, তোমরা নিজের দেশকে জানো, স্বদেশকে চেনো। নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য জানা না থাকলে স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পারবে না।

এসব কথা শুনে প্রীতির সামনের মোটা কালো দাগ মুছে যেতে থাকে। ফুটে ওঠে আলোর রেখা। ও যেন কলম্বাসের মতো একটি জাহাজে করে অন্ধকার সমুদ্র পেরুচ্ছিল। সেই অন্ধকার কাটছে। ওর সামনে ফুটে উঠছে এক মহাদেশের তটরেখা। সে রেখায় দাঁড়িয়ে আছে মণীশকাকা, উষাদি, সূর্য সেন। ওরা এক। এই মহাদেশে ওকে পৌঁছতে হবে। জ্বলজ্বল করছে মুখ, প্রদীপ্ত চাউনি, ক্ষুদিরামের উত্তোলিত হাতে বোমা। কী নির্ভীক, কী দ্বিধাহীন! প্রীতি ভাবে, এমন মানুষ হতে পারা একটি বড়ো গৌরবের কথা। ওর কৈশোরের চেতনায় পলি পড়ে ফুরিয়ে যায় ওর হেসেখেলে বেড়ে ওঠার দিন। ও গম্ভীর, চিন্তামগ্ন এবং দ্বিধাহীন হতে থাকে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ও ওদের বাগানের নিজস্ব জায়গাটিতে চলে আসে। ছোটো বোন শান্তি ওর সঙ্গী। সব সময় ছায়ার মতো সঙ্গে থাকে। এই বাড়ি নিয়ে শান্তির উচ্ছ্বাস বেশি। বাড়িটি শহরের শেষ প্রান্তে—শহর এবং গ্রামের কেন্দ্রস্থলে। ওই বাগানে এলে মনে হয়, ও শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে। বাসার দক্ষিণে বড়ো বড়ো আম-জাম-কাঁঠাল গাছ। ফাঁকে ফাঁকে শটির ঝোপ, জংলি কচুবন, বুনো লতা। কাশফুল আর ঘেঁটুফুল ফুটে থাকে, ঝরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বিচি হয়, আবার গাছ গজায়। পায়ের নীচের মাটি ভেজা। ঘন গাছের জন্য ঠিকমতো সূর্যের আলো পায় না। ঘাসের ওপর হাঁটলে মায়াবী স্নিগ্ধ স্পর্শ প্রীতিকে সেই মহাদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে ও পৌঁছতে চায়। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নালার উত্তর পাড়ে, ওদের বাসার দিকে, আসামলতার জঙ্গল। প্রীতিলতার মনে হয়, এটি ওই মহাদেশের তটরেখা। শীতকালে অতিথি পাখি আসে ওখানে, যেন ওরা প্রীতির জীবনে নতুন বার্তা কলকলিয়ে বলে —চলো যাই চলো যাই। কোথায়? প্রীতিলতা নিজেকে প্রশ্ন করে। পাখিদের কলকল থামে না। পাখিরা ওকে ক্ষুদিরামের কাছে যেতে বলে। আবার সেই শব্দ—চলো যাই, চলো যাই। ও বিহ্বল, ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে জঙ্গলের দিকে। দেখতে পায় আলো ফুটছে—আলো।

এই বাগানে একটা ঢিবির মতো আছে। ও ঢিবিটা পরিষ্কার করে বসার জায়গা করেছে। ফাঁক পেলেই এখানে এসে বই পড়ে। ক্লাসে সবসময় প্রথম থেকে তৃতীয়ের মধ্যে থাকে যেই মেয়ে, অন্য বই পড়লে কী এসে যায়? তাই অন্য বই পড়ায় বাবা-মার কাছে ওর কোনো বারণ নেই। ওর সুবল দাদা মাঝে মাঝে ওর কাছে বিভিন্ন ধরনের বই রেখে যায়। বলে যত্ন করে লুকিয়ে রাখবি। কেউ যেন দেখে না। প্রীতিলতা কখনো প্রশ্ন করেনি যে, দেখলে কী হবে। জানতে চায়নি, লুকিয়ে রাখ কেন? ও যত্ন করে বইয়ের প্যাকেট নিজের টিনের বাক্সে ঢুকিয়ে রাখে। সেখান থেকে 'ক্ষুদিরাম' বইটি নিয়ে ও নিঃশব্দে বাগানে আসে। উষাদি ওর চেতনায় প্রচন্ড আঘাত দিয়েছে। সুবলদাদার বইগুলো সে আঘাতে ঔষধ। ও যত পড়ে, তত ওর মাথা গরম হয়ে ওঠে। কী অসাধারণ এক একজন মানুষের জীবন! কী গৌরবের, কী মহত্ত্বের! প্রীতিলতা ক্ষুদিরামের শেষ ইচ্ছার কথা পড়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। ফাঁসির আগে ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তোমার শেষ ইচ্ছে কী?' ক্ষুদিরাম বলেছিল, 'আমি বোমা তৈরি করতে পারি। অনুমতি পেলে ওটা সবাইকে শিখিয়ে দিতে চাই।' এ পড়েই স্তব্ধ হয়ে যায় প্রীতিলতার কৈশোর। ও বড়ো হয়, বড়ো হয়, বড়ো হয়।

রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে গেলে হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় পড়ে 'বাঘা যতীন', যে ওড়িশার সমুদ্র তীরে গড় তৈরি করে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। উষাদির দেওয়া 'ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই' পড়ে ও অভিভূত হয়। খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে ইংরেজ সৈন্যদের ডাক দিয়েছিল। বলেছিল, 'মেরি ঝান্সি নেহী দুংগী।' প্রীতিলতা নিজেকে প্রশ্ন করে, আমরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কি এমন হতে পারি না? বাঘা যতীনের কী সাহস আর বীরত্ব—ওরা তো আমাদের মতো মানুষের জন্যই মরে যায়—ওরা চায় আমাদের মঙ্গল, আমাদের মুক্তি। এক সময় হ্যারিকেন নিভিয়ে দেয় প্রীতি। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক প্রবল হয়ে ওঠে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। বিছানায় শুয়ে ওর ভীষণ কান্না পায়। ওর বালিশ ভিজে যায়। বিকেলে বেণি বেঁধেছিল। দুটো বেণি ছড়িয়ে থাকে বালিশের দুপাশে। ও ভাবে, এমন কাউকে খুঁজতে হবে, যাদের সঙ্গে স্বদেশিদের যোগাযোগ আছে। হঠাৎ ওর মনে হয় সুবলদা এইসব বই ওর কাছে লুকিয়ে রাখার জন্য দিয়ে যায় কেন? উষাদি বলেন, 'তেমন বই পড়তে হবে যা পড়লে জানা যাবে দেশের সত্যিকার ইতিহাস।' তা হলে কি উষাদি, সুবলদা এবং সবাই স্বদেশি? অন্ধকারে প্রীতির দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও দেখতে পায় মহাদেশের তটরেখা। ওর কপালে ঘাম জমে। পরক্ষণে দমে যায় মন। একথা তো ওঁদের জিজ্ঞাসা করা যাবে না। ও বিছানায় উঠে বসে। পাশে ছোটো দু-বোন ঘুমোচ্ছে। ওদের কোনো ভাবনা নেই। ওরা ওর মতো নয়। ছোটো বোনের পা এসে পড়ে ওর কোলের ওপর। ও নিঃশব্দে পা নামিয়ে, দরজা খুলে বারান্দায় আসে। বারান্দায় চৌকির ওপর বসে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে উঠোনে। একটু পরে দরজা খুলে মা বেরিয়ে আসে। প্রীতিকে দেখে অবাক হয়—'ওমা, তুই এখানে বসে রয়েছিস যে!'

'ঘুম আসছে না মা।'

'গরম লাগছে, না রে?'

'হাঁ মা, খুব গরম।'

'গরমে আমারও ঘুম আসছে না।'

ওর মা হাতে তালের পাখাটা নিয়ে চৌকির ওপর বসে।

'পাখাটা আমাকে দাও। আমি তোমাকে বাতাস করি।'

প্রীতিলতা মায়ের হাত থেকে পাখা নিয়ে বাতাস করে। ওর মা আঁচল বিছিয়ে চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে। বারবারই সুবলদার কথা মনে হয় প্রীতির। কেন সুবলদা বলে, 'এই বইগুলো খুব গোপনে রাখতে হবে। কেউ জানলে ক্ষতি হবে।' কার ক্ষতি? স্বদেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছে তাঁদের জীবনের ওপর লেখা বই। স্বদেশের মানুষের কথা স্বদেশের মানুষ জানলে কীসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ক্ষতি? ওর রাগ হয়। মনে মনে বলে, এ অন্যায়। ইংরেজরা আমাদের যা হুকুম করবে, তা আমাদের মানতে হবে কেন? সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, ওরা এ দেশে আসবেই বা কেন? আমাদের দাবড়াবে কেন?

এক সময় ওর মা উঠে বসে। বলে, 'ঘুমুতে যা রানি। এভাবে বাইরে বসে থাকতে নেই।'

আকস্মিকভাবেই ও বলে, 'আমাকে একটা কথার উত্তর দাও তো মা?'

'এত রাতে আবার কী কথা?'

'আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে বেসরকারি স্কুলগুলো ছুটি দিল। আমাদের সরকারি স্কুল ছুটি দিল না কেন? আমরা কি দেশবন্ধুর মতো এত বড়ো মানুষের জন্য শোক করব না?'

'কী জানি মা, এসব কথার উত্তর তো আমি দিতে পারব না। তুই সুবলকে জিজ্ঞেস করিস।'

'সুবলদাকে?'

'হ্যাঁ রে। ওর সঙ্গে স্বদেশিদের যোগাযোগ আছে। ও সব জানে।'

'কী বলছ মা?'

'চুপ, আস্তে। এ কথা যেন আর কেউ না জানে। জানিস তো, এসব কিছু জানাজানি হলে ইংরেজ সরকার আমাদের বাড়িতে পুলিশ পাঠাবে। তোর বাবার হয়রানি হবে। চাকরিও চলে যেতে পারে।'

'ও।'

প্রীতিলতা অস্ফুট শব্দ করে।

'যা মা, ঘুমো গিয়ে। আমিও যাই।'

দুজনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। কিন্তু প্রীতির মনে হয়, ওর চারদিকের দরজা খুলে গেছে। ও এখন থেকে কিছু জানতে পারছে, বুঝতে শিখছে। গভীর আনন্দ নিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন বাগানে ওর প্রিয় ঢিবির ওপর বসে 'দেশের কথা' বইটি পড়ছিল। পেছন থেকে সুবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এসে ওকে চমকে দেয়।

‘রানি, কী করছিস এখানে?’

‘তোমার লুকিয়ে রাখা বইগুলো সব পড়ে শেষ করেছি।’

‘বাব্বা, তুই তো বেশ কাজের মেয়ে! কিন্তু সাবধান, তোর কাছে যে বইগুলো আছে, সব বই সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।’

‘ভয় নেই। গত রাতে মা আমাকে বলেছে যে, তুমিও একজন স্বদেশি। আমার কী যে ভালো লাগছে!’

সুবল অবাক হয়ে ওর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ওকে আর কিছু বলতে পারবে না। বিপ্লবীদের গোপনীয়তাই বড়ো ধর্ম।

‘আচ্ছা দাদা, লক্ষ্মীবাইকে তোমার ভালো লাগে না? কত যে সাহস!’

‘হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে। ইংরেজ শাসকরা তো দীর্ঘদিন ধরে এই দেশের ওপর শোষণ চালাচ্ছে। ওদের তাড়াবার জন্য ১৭৫৭-তে রানি ভবানী, আর তাঁর একশো বছর পর এই রানি লক্ষ্মীবাই, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে জীবন দিয়েছে। তাই তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।’

হাতের বইটি বন্ধ করে প্রীতি দাঁড়িয়ে যায়। ওর মুখে পলকা ছায়া। সে ছায়া আরো গাঢ় হয়। সুবলের দৃষ্টি এড়ায় না। ও আগ্রহ নিয়ে বলে, ‘সুবলদা এতকাল আগে থেকে মেয়েরা যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়তে পারে, তবে আমি কেন পারব না? আমার খুব ইচ্ছে করছে ওদের মতো হতে। আমার ডাক নাম রানি। নাটোরের রানি আর ঝাঁসির রানি যা পেরেছিল, চট্টগ্রামের রানিও তা পারবে। বলো না — কেন, আমি পারব না?’

‘নিশ্চয়ই পারবি। বড়ো বেশি সাহসের কথা উচ্চারণ করেছিস বোন। তুই তো জানিস না কঠোর নিয়ম আর শৃঙ্খলার মধ্যে চলতে হয় বিপ্লবীদের। আমাদের একটাই মাত্র কথা—‘কর্ম আর মৃত্যু চাই, প্রশ্ন করার কিছু নাই।’

‘আমি এসব মানতে পারব দাদা।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘ধীরে, বোন ধীরে। বইগুলো তুই পড়েছিস ক্ষতি নেই। কিন্তু তখনকার মতো যুদ্ধ করা এখন আর চলবে না। তোকে এখন স্বদেশিদের সাহায্য করার কাজ করতে হবে।’

‘কেমন? কী কাজ?’

‘টাকা-পয়সা, অলংকার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা, গোপন বইপত্র বা অন্য কিছু রাখা, স্বদেশিদের লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে সহযোগিতা করা — এইসব।’

‘সবকিছুই আমি পারব। তুমি আমাকে কাজ দাও। আমি কাজই করব, কোনো প্রশ্ন করব না।’

‘সামনে তো ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে নে।’

‘তুমি দেখে নিও, পরীক্ষা আমার ভালো হবে। পরীক্ষা নিয়ে আমি ভাবি না। একবার পড়লেই আমার পড়া মনে থাকে।’

সুবল হাসতে হাসতে বলে, ‘তা আমি জানি। সাবধানে থাকিস। ছোট্ট ভুলেই অনেক বড়ো ক্ষতি হয়। ভালো রেজাল্ট করলে ঢাকা বা কলকাতায় পড়তে যাওয়া হতে পারে। যাই।’

প্রীতিলতা মাথা নাড়ে। বাগান পেরিয়ে চলে যায় সুবল। আনন্দে থই-থই প্রীতিলতার হৃদয়। বলে, পাখি তুমি বলতে, চলো যাই। এখন আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি। ও দৌড়ে ঘেঁটুফুলের কাছে যায়। প্রাণভরে শ্বাস নেয়। শ্বাস ছেড়ে বলে, আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি। বাগান জুড়ে বুনো গাছের মাথায় কোটি কোটি নক্ষত্র ফুল হয়ে ফুটে থাকে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের প্রীতিলতা শৈশবের প্রীতি হয়ে যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে উঠোনে। ওর সামনে কোনো বাধা নেই। ও যতদূর যেতে পারে, সেটাই পথ। যতটুকু ওর ক্ষমতা, সেটাই লক্ষ্য। যতটুকু সাধনা, ততটুকুই সিদ্ধি।

শৈশবের কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে, অনেকের কাছে শুনেছে, ওর জন্ম-সংবাদ শুনে বাড়িতে শোকের ছায়া নেমেছিল। মেয়ে জন্মানোর জন্য মন খারাপ হয়েছিল ওর বাবার। তার ওপর ওর গায়ের রঙ ছিল কালো। গরিবের ঘরে কালো মেয়ের জন্ম তো মহাপাপ। ও বুঝতে পারে না যে, মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধ কোথায়? কেন অখুশি হয় পরিবারের সবাই? ও তো পরীক্ষায় ওর ভাইয়ের চাইতে রেজাল্ট বেশি ভালো করে, তবু বাবার সব টান ছেলের জন্য। কোনোদিন মুখ ফুটে বলে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এজন্য ওর কষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আছে। ও দেখিয়ে দিতে চায় যে, মেয়ে হয়েও ও এমন কাজ করবে যার জন্য সব বাবারা মেয়ে হওয়ার দুঃখ ভুলে যাবে।

এই কথা মনে করেই ও অন্ধকার ছাদে একা একা শব্দ করে হেসে ওঠে। পৃথিবীর বাবাদের যদি খালি ছেলেই হয়, তা হলে খুব মজা হয়। একদিন দেখা যাবে, পৃথিবী মেয়ে-শূন্য হয়ে গেছে এবং পৃথিবীর সব বাবা মহা-আনন্দে দিনযাপন করছে। না, অসম্ভব, তখন শুকিয়ে যাবে বাবাদের মুখ। মেয়ে না থাকলে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে কে? বাবারা এমন অবিবেচক হয় কেন? কী বিচিত্র এই সৃষ্টির কলরব! সৃষ্টির ধারাবাহিকতা না থাকলে কেমন হবে পৃথিবী? তবু নারী-পুরুষের এই বেঁচে থাকার জন্য আমরা স্বাধীনতা চাই। জীবন উৎসর্গ করি। বুকটা মুচড়ে ওঠে। শৈশব নয়, কৈশোর নয়। ওর এখন যৌবন। এই যৌবন বিপ্লবের জন্য। এই যৌবন রামকৃষ্ণকে ভালোবাসার জন্য। ওর আর ফিরে আসার পথ নেই।

শীতের রাত বলে শহরটা দ্রুত শুনশান হয়ে যায়। গির্জায় ঘন্টাধ্বনি ভেসে আসে। ঢং-ঢং-ঢং, যেন ভূগোলে পড়া জলপ্রপাতের মতো ঘন্টাধ্বনি। পাহাড়-বন পেরিয়ে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে ওর বুকের তটে। জেলখানায়ও কি এখন এমন ঘন্টা পেটাচ্ছে? একলা কুঠুরিতে রামকৃষ্ণ কি জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে? ও কি জানে যে, ওর জন্য প্রীতিলতার বুকের ভেতর ভালোবাসার জলপ্রপাত? ওকে জানতে হবে। ও জানবেই। ও জেনে যাবে যে মৃত্যুর আগে প্রীতিলতা ওকে ভালোবেসেছিল। মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে যে বাবার দুঃখ হয়, সে মেয়েটির জন্য আর একজন মানুষের তো সুখ হতে পারে। এই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সে তো একটি গভীর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে। পরক্ষণে মনে হয়, একজন বিপ্লবীর কাছে কি এই ভালোবাসা কাঙ্ক্ষিত? নক্ষত্র-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রীতিলতা নিজেকেই উত্তর দেয়, সেও তো মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

৬

প্রীতিলতাকে দেখে অবাক হয়নি রামকৃষ্ণ। ও তো জানত, প্রীতিলতা আসবে। তবে এত তাড়াতাড়ি এটা ধারণা করতে পারেনি। মনে হয়েছিল, ও হয়তো সুযোগ করতে পারবে না। জেলখানায় দেখা করার জন্য নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। ওর শরীর ভালো নেই। ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। মাঝে মাঝে এমন ঝাঁকুনি দিয়ে জ্বর আসে, তখন ছোটো সেল গাঢ় অন্ধকারে ভরে যায়। এর মধ্যে জেলগেটে প্রীতিলতার আশার খবর ওকে উৎফুল্ল করে। প্রীতিলতাকে দেখে ওর ভালো লাগে। জ্বরের কথা মনে থাকে না।

প্রীতিলতা মৃদু হেসে বলে, 'আমি এসেছি আপনার অভিজ্ঞতাটুকু নিতে। আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।'

'আমি কি বিরক্ত হয়েছি?'

'বিরক্ত হননি, তবে বিপ্লবীর কর্তব্য পালন করতে বলেছেন।'

রামকৃষ্ণর মুখ লাল হয়ে যায়। বলে, 'অন্যায় তো বলিনি।'

প্রীতিলতা শান্ত স্বরে বলে—'অন্যায় বলবেন কেন? অন্যায় বলা তো আপনার শোভা পায় না। সত্য যত নির্মম হোক, সেই নির্মমতাটুকুই আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। আমি জানি আপনি তা করবেনই।'

শেষের দিকে অভিমানে প্রীতিলতার কণ্ঠ ধরে আসে। রামকৃষ্ণের বুক কেঁপে যায়। এই কি সময় ভালো লাগার? এই কি সময় জীবনের নতুন মোড় নেবার? আর কয়দিনই বা আয়ু? তবু কেন এমন হচ্ছে? চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, প্রীতিলতা তুমি আর এসো না। এমন করে কথা বোলো না। কিন্তু সাধ্য কই? প্রীতিলতাকে এই কথাটুকু বলা ক্রেইগ-হত্যার চেয়েও কঠিন কাজ। ওর মনে হয়, শরীরের তাপ বাড়ছে। প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। তখন প্রীতিলতা মায়াবী কণ্ঠে বলে, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘হ্যাঁ, ম্যালেরিয়ায় ভুগছি।’ রামকৃষ্ণ হেসে পরিবেশ হালকা করে, ‘জানেন এই অসুখের সবচেয়ে খারাপ সময় কোনটা?’

‘কোনটা?’ প্রীতিলতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

‘সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। নইলে শরীরে তাপ থাকাটা মন্দ নয়। এই উষ্ণতায় মনে হয়, যেন কোনো প্রিয়জন সাহচর্য দিচ্ছে।’

‘বেশ তো সুন্দর করে বললেন। বুঝতে পারছি, এই দেশ কবিতার দেশ। তবে আমার কবিতা আসে না।’ প্রীতিলতা হেসে ফেলে।

রামকৃষ্ণ বলে, ‘আর একদিন আপনাকে প্রাণভরে কবিতা শোনাব। তবে ম্যালেরিয়ার আর একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে। যদি কেউ জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে, সেটা শুনতে আমি দারুণ মজা পাই। কত যে অসংলগ্ন কথা মানুষের অবচেতন মন থেকে বেরিয়ে আসে!’

প্রীতিলতা হাসতে হাসতে বলে, ‘মনের হিসেবটাই এমন গোলমেলে। বোঝাই দায়। থাকগে, এবার আপনার কথা বলুন। কখন আবার সেপাই এসে বলবে যে, সময় ফুরিয়ে গেছে।’

‘খুব খারাপ লাগে, না?’

‘হ্যাঁ, মনে হয় কথাটা শোনা খুব কষ্টের। ও যদি বলত যে, আপনাদের জন্য কোনো সময় বাধা নেই, তাহলে যে কি আনন্দ হতো!’

‘তাহলে কী করতেন?’

‘যতক্ষণ ভালো লাগত, ততক্ষণ থাকতাম। তারপর একসময় বলতাম, আজ যাই। আবার আসব। বেশ তো, স্বাধীনতার আনন্দ পাওয়া যেত। বন্দিজীবনের স্বাধীনতা।’

রামকৃষ্ণ জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয়। মুখটা কেমন শুকনো লাগছে। জ্বরে মাথা ঝিমঝিম করে। তবু এই মুহূর্তে প্রীতিলতার উপস্থিতি অনেক মনোরম। ও কি পারে না একেবার কপালে হাত ঠেকাতে?

‘কী ভাবছেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রামকৃষ্ণ অন্যদিকে তাকায়। প্রীতিলতার চোখের দিকে তাকাতে ওর ভয় করে। প্রীতিলতা প্রশ্ন করে কেন? ও কি ওর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে? ও ঢোক গিলে বলে, 'ভাবছি কোথায় সেদিন শেষ করেছিলাম।'

'শেষ করেছিলেন এই বলে যে, লাকসামের টিকিট কাটলেন।'

'বাহ্, আপনার স্মরণশক্তি খুব ভালো তো?'

'আপনারও ভালো। তবে আজ আপনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। বোধ হয় ম্যালেরিয়ার কারণে।'

'তাই হবে।'

রামকৃষ্ণ প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে। ঘোরের মধ্যে বলতে শুরু করে, 'সেদিন রাত সাড়ে ন-টার দিকে দেখলাম ট্রেন আসছে। ছোটো আলোর বিন্দুটি ধেয়ে আসছে। একসময় আলোকিত হয়ে যায় স্টেশন। আমি আর কালীপদ আড়ালে আছি। স্টেশনে লোকজন তেমন নেই। আমাদের আগের প্ল্যান অনুযায়ী সুশীল সেন দ্রুত নেমে এল ট্রেন থেকে। আমরা এগিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। ফিসফিস করে বলল, "এই ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরায় ক্রেইগ সাহেব আছে। লম্বা চেহারা, ওভারকোট গায়ে জড়ানো।" কালীপদ জিজ্ঞেস করল, "কী করে বুঝলে যে, এই লোকই ক্রেইগ?" ও বলল, "ক্রেইগকে বিদায় জানাবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-সুপারিনটেনডেন্ট, সুপার সাহেব, পুলিশ ইনস্পেকটর ও আরো অনেক সরকারি কর্মচারী স্টেশনে এসেছিল। এতেই আমি ধরে নিয়েছি যে, ইনিই ক্রেইগ। তা ছাড়া গাড়িতে আর কোনো ইংরেজ নেই।"

'সুশীল এদিক-ওদিক তাকায়। ওকে দ্রুত এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ও কিছুটা উত্তেজিত। আমাদের মতো নির্বিকার নয়। কোন্ কামরায় ক্রেইগ আছে সুশীল আমাদের তা ইশারায় দেখিয়ে দিল। দেখলাম, রাইফেল হাতে গার্ড কামরা পাহারা দিচ্ছে। মনে মনে হাসলাম। নিজেকেই বললাম, আর কিছুক্ষণ পর গার্ডের হাতের রাইফেল স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমাদের পিস্তলের গুলি ফুটো করে দেবে ক্রেইগের বুক। সুশীলকে বিদায় দিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। লাকসামে ট্রেন থামতেই কালীপদ নেমে কলকাতার টিকিট কেটে আনল। লাকসামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এসে ক্রেইগের দরজার সামনে কোনো গার্ড দেখলাম না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দুজনে কিছুক্ষণ স্টেশনে পায়চারি করলাম। পান কিনে খেলাম। গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বাজতেই' দুজনে ক্রেইগের কামরার পাশে একটি তৃতীয় শ্রেণির কামরায় উঠে বসলাম। গাড়ি চাঁদপুরের দিকে এগুচ্ছে। আস্তে আস্তে ট্রেনের গতি বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে দুলুনি। পেরিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার প্রান্তর, গ্রাম, ধানখেত, ছোটো ছোটো পুল। এই সবকিছু একই গতিতে পাল্লা দিয়ে ছুটছে আমার মাথার ভেতরে। বারবার মাস্টারদার নির্দেশ তীব্র আলোর রেখা হয়ে অন্ধকার বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। গাড়ির ঝমঝম শব্দের সঙ্গে শুনতে পাই সেই কণ্ঠ— "না মেরে ফিরে আসবে না।" দৃঢ় প্রত্যয় জেগে ওঠে করোটিতে, পেশিতে, চিন্তায়, আকাঙ্ক্ষায়, বিবেকে, মননে। পকেটে কলকাতার টিকিট। সুতরাং যেখানেই সুযোগ পাই, সেখানেই ক্রেইগকে ধরব—চাঁদপুর হোক, স্টিমার হোক, গোয়ালন্দ ঘাটে হোক, শেয়ালদা স্টেশনে হোক—দীর্ঘ পথ, অফুরন্ত সময় —সুযোগ একটা করে নিতেই হবে।

'ভোর রাত, চারটের দিকে চাঁদপুর স্টেশনে ট্রেন এসে থামল। আমরা ঝটপট গাড়ি থেকে নামলাম। দেখলাম যাত্রীরা নেমে যে যার পথে চলে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশা স্টেশনের টিমটিমে আলোকে অস্পষ্ট করে রেখেছে। দেখলাম, ক্রেইগের দরজার সামনে তিরিশজন লাঠিধারী পুলিশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। খেয়াল করলাম, কেবিনের দরজায় একজন লম্বা লোক, গায়ে ওভারকোট। সে নামছে, কিন্তু আমাদের দিকে পেছন ফেরা, মুখ দেখা যাচ্ছে না। পুলিশরা তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। আমরা দুজনেই তড়িৎগতিতে পুলিশের বেষ্টনি ভেঙে ঢুকে পড়লাম। মাত্র দু-তিন হাত দূর থেকে গুলি করলাম ওভারকোট পরা লোকটিকে। গুলির শব্দে লাঠিধারী পুলিশের দল যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। গুলিবিদ্ধ লোকটিও দৌড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু যাবে কোথায়? কালীপদ ওর পিঠে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে গুলি করল। মনে হল, ওর পিঠটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ও 'বাবাগো' বলে প্লাটফরমের ওপর উল্টে গেল। আমি বুকের নিশানা করে শেষ গুলিটা ছুঁড়তে যাচ্ছিলাম, তখন কালীপদ আর্তনাদের মতো বলল, "রামকৃষ্ণ, এ তো ক্রেইগ নয় এ যে দেখছি বাঙালি!"

'ততক্ষণে ক্রেইগের কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। বুঝলাম, আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এ ভুল আর পুষিয়ে নেওয়া যাবে না। এক্ষুনি আমাদের অন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দুজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দুজনের দিকে তাকালাম। আমরা দুজনেই মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেলাম। কিন্তু সেটা একটা বিন্দু-সময় মাত্র। দুজনে ভাবতেই পারলাম না যে, ক্রেইগ কোথায়। ও কোনদিক দিয়ে পালাল? বেশি চিন্তা করার সময় ছিল না। তখুনি আমাদের পাশে আর একটা ট্রেন দাঁড়াল। আমরা দুজনেই গাড়িটার দুটো বগির মাঝখানের ফাঁকা দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অচেনা জায়গা, কোনদিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। সামনের কোনোকিছু ঠাহর করাও মুশকিল। দুজনে আন্দাজের ওপর দৌড়চ্ছি। কিছুদূর যেতেই নদীতে পড়ে যেতে যেতে হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল পা। উপায়ান্তর না দেখে প্লাটফরমের দিকে ফিরতে থাকলাম। মনে হয়, যে কোনো দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারি। পুলিশরা কোথাও ওত পেতে আছে কিনা জানি না। নানাকিছু ভাবছি আমরা।

'তখন কালীপদ আমাকে সিগারেট জ্বালাতে বলল। কারণ, বোমা বিস্ফোরণের জন্য আগুন দরকার। আমাদের দুজনের কোটের পকেটে তখন দুটো বোমা রয়েছে। আমি সিগারেট জ্বালালাম। খুব সতর্কতার সঙ্গে প্লাটফরমে ঢুকছি। কিন্তু কী আশ্চর্য! প্লাটফরম জনমানবহীন, শূন্য। এখানে কিছুক্ষণ আগেও কেউ ছিল এমনটা ভাবাই কষ্টকর। দমধরা নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে দুজনে পেরিয়ে এলাম। কালীপদ সামনে, আমি পেছনে, এভাবে এগোচ্ছি। কেউ যদি আক্রমণ করতে আসে তো মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, হৃৎপিন্ড ফুটো করে চলে যাবে বুলেট। আমার আর তখন একটুও ভয় করছিল না। জোর কদমে হেঁটে যাবার উদ্দীপনা পেয়ে বসেছে। চাঁদপুর পুলের গোড়াতে পৌঁছতেই টিকিট কালেক্টর টিকিট চাইল। আমরা বিপদ গুনলাম। না জানি কোনো মতলব আছে কি না। কালীপদ যখন টিকিট বের করছিল, আমি তখন খুব সাবধানের সঙ্গে চারদিকে খেয়াল করছিলাম। যাহোক, টিকিট দেখিয়ে দুজনে পুলের ওপর উঠলাম। দেখলাম, কোথাও কোনো লোক নেই। আলাদিনের চেরাগের ঘষায় কেউ যেন এক ফুৎকারে মানুষগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। 'পুল থেকে নেমে গেলাম চাঁদপুর বাজারে। তখনো চারদিক অন্ধকার, কোনোকিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ঘন কুয়াশা অন্ধকারের ঘনত্ব আরো তীব্র করেছে। পথঘাট অচেনা, তাই আমাদের কোনো ভুল করা চলবে না। আমরা দুজনেই ঠিক করলাম, রেল লাইন ধরে চট্টগ্রামের দিকে এগোবো। আপাতত চট্টগ্রামই আমাদের গন্তব্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রামকৃষ্ণ একটুক্ষণ থেমে থাকে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। টের পাচ্ছে যে, জ্বর বাড়ছে। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নেয়।

প্রীতিলতা উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, 'কথা বলতে খারাপ লাগছে?'

রামকৃষ্ণ উদ্ভ্রান্তের মতো তাকায়। বলে, 'আমি তো কথা বলছি না। এ কি শুধুই কথা?'

প্রীতিলতা নিজেও জানে, রামকৃষ্ণ যা বলছে তা শুধুই কথা নয়। তবু চুপ করে থাকে রামকৃষ্ণের আরো কিছু বলার অপেক্ষায়।

'এ শুধু কথা নয়, এ আমার জীবন এবং আমাদের জীবন। যে জীবন আমরা একজন শুধু মায়ের কোল থেকে শুরু করিনি। এ জীবন আমরা অনেকে পেরিয়ে এসেছি—একটা পথ তৈরি হয়েছে। আজ আমার ভালো লাগছে, প্রচণ্ড ভালো লাগছে। জীবনের বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেটুকু আপনার কাছে রেখে যেতে পারছি বলে।'

প্রীতিলতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'তাহলে, তারপর?'

'তারপর আমরা হেঁটে যাচ্ছি রেললাইন ধরে। আমরা তো হেঁটে যাচ্ছি। আমরা হেঁটে যাচ্ছি। আমরা হেঁটে যাচ্ছি। প্রীতিলতা, আমরা হেঁটে যাচ্ছি।'

প্রীতিলতার দু-চোখে অতলান্তিক বিস্ময়। ওর কেমন খটকা লাগে। রামকৃষ্ণের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। গায়ের কালো রঙে লালের অদ্ভুত বিচ্ছুরণ।

প্রীতিলতা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'বুঝতে পারছি না, বিপ্লবীদের কি এত আবেগ মানায়?'

রামকৃষ্ণ গভীর প্রত্যয়ে থেমে থেমে বলে, 'আবেগ আছে বলেই তো আমরা মৃত্যুকে ভালোবাসি। মৃত্যুকে আমাদের কোনো ভয় নেই। এই আবেগ আছে বলেই তো মুক্ত স্বদেশ চাই। আমাদের তো স্বপ্ন যে, আমরা একটি স্বাধীন দেশের মানুষ হব।'

'আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারলে, আমাদের পরবর্তী ছেলেমেয়েরা করবে।'

'অবশ্যই করবে। ক্ষুদিরাম জীবন দিয়েছে ১৯০৮-এ। তারপর আমরা তো এসেছি। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১৯৩১। আমরা না পারলে আরো কেউ আসবে।'

প্রীতিলতা গাঢ় কণ্ঠে বলে, 'আসবে। আসতেই হবে।...সেদিন তারপর কী করলেন?'

'সেদিন ছিল পয়লা ডিসেম্বর। বাংলায় অগ্রহায়ণ। কৃষকের নবান্নের সময়। রেললাইনের কাঠের স্লিপারের ওপর দিয়ে কখনো হাঁটছিলাম, কখনো শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে। দেখলাম সূর্য উঠছে। আমাদের গায়ের ওপর দিনের সোনালি আলো। আমাদের লাল ও নীল র□্যাপারের ওপর চুঁইয়ে পড়ে রোদ। ভালো লাগছিল। হেঁটে কতকগুলো স্টেশন পেরিয়ে এলাম। দেখলাম, আমাদের পাশ দিয়ে সশস্ত্র পুলিশভর্তি ট্রেন দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে। বুঝলাম, ওরা খবর পেয়ে গেছে। তাই চাঁদপুর যাচ্ছে। আমরা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। বেলা দশটার দিকে হাজিগঞ্জ স্টেশনে এলাম। হাজিগঞ্জ থেকে চাঁদপুরের দূরত্ব আঠারো মাইল। দুজনে একরকম নিঃশব্দেই হাঁটছি। দুজনেরই মন খারাপ। কারণ আমরা তো বুঝে গিয়েছি যে, আমরা ক্রেইগকে মারতে পারিনি। তাহলে কাকে মারলাম? চিন্তা করলেই মাথা গরম হয়ে যায়। কোনো অজ্ঞাত, নির্দোষ ব্যক্তিকে মেরেছি—এই কথা ভাবতেই কেমন একটা বিবেকের দংশন হচ্ছিল। এইসব মাথায় নিয়ে এসে পৌঁছলাম গ্রান্ড ট্রাংক রোড ও রেললাইনের সংযোগ স্থানটাতে। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে খুব অবসন্ন লাগছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় যে চা আর ডালপুরি খেয়েছি, তারপর তো আর কিছু খাওয়া হয়নি। তার ওপর মানসিক ধকল আমাদের আরো নির্জীব করে দিয়েছিল। কারণ, স্টেশনের সেই উত্তেজনার পর এখন তো স্থির হয়েছি। এখন পরিস্থিতি বিচার করার সময়। দুজনেই একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বসলাম। বেশি কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। দোকানদার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?" কালীপদ একটু দ্বিধা করে বলল, "এই কাছ থেকেই।"

"কোথায় যাবেন?"

"এই সামনে।"

খুব অস্পষ্ট উত্তর। দোকানদারের সন্দেহ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু ও আমাদের এমন আমতা আমতা উত্তর খেয়াল না করেই বলল, "জানেন চাঁদপুরে খুব হইচই পড়ে গেছে। কে বা কারা ভোররাতে স্টেশনে এসডিও না কাকে যেন গুলি করে মেরেছে।" কালীপদ বিস্ময় প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

করে বলল, “তাই নাকি? শুনিনি তো?”

দোকানি নিচুস্বরে বলল, “আমার কী মনে হয় জানেন? আমাদের স্বদেশিরা এটা করেছে।”

“আপনাদের স্বদেশি?”

“বাহ্, আমাদেরই তো! স্বদেশিরা তো এই দেশের স্বাধীনতার জন্যই লড়ছে।”

“থাক, এসব কথা কাউকে বলবেন না। ঠিক আছে আমরা যাই।”

দোকানি প্রথমে একটু থমকে যায়। তারপর হেসে বলে, “ভয় পেলেন? আমি ভয় পাই না।”

‘আমরা ওর কথায় মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসি। বুঝতে পারি, ও বোকা এবং সরল। আমাদের এখানে আর থাকা উচিত নয়।

‘আমরা এখন পথ চিনে গেছি। গ্রান্ড ট্রাংক রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। সূর্য মাথার ওপর। রোদ বেড়েছে। গরম লাগছে। একবার ভাবি, গায়ের লাল র□্যাপারটা মাথায় জড়িয়ে নেব। তাহলে রোদের তাপ থেকে মাথাটা বাঁচবে। কিন্তু সে উপায় ছিল না। বাধ সাধে কোমরে বাঁধা রিভলবার। লম্বা মুখওয়ালা রিভলবারটার বাঁকানো মোটা হাতলটা মাথা বের করে থাকে। র□্যাপার না হলে ওটাকে ঢেকে রাখা যায় না। এদিকে রোদে এবং একটানা হাঁটার কারণে আমরা ঘামতে শুরু করেছি। বুকের ভেতর দুশ্চিন্তা। বুঝতে পারছি না যে, হেঁটে আমরা কীভাবে চট্টগ্রামের দূরত্ব অতিক্রম করব? পাশ দিয়ে কয়েকজন স্কুলের ছাত্র হেঁটে যাচ্ছিল। ওদের মুখে চাঁদপুর শব্দটি শুনে দুজনেই চমকে উঠলাম। ভাবতেই পারি না যে, এত দ্রুত খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। নাকি আমারই মনের ভুল? আমাদের অবচেতন থেকে শব্দটা উঠে আসছে? গরমে ছটফট করছি। কোট ঘামে ভিজে গেছে। র□্যাপারটা অসহ্য লাগছে। টান দিয়ে খুলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। উপায় নেই। চট্টগ্রামে না ফেরা পর্যন্ত এই বন্দিদশা কাটবে না। তাই আবার দ্রুত পা চালালাম। আরো কয়েক মাইল পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম মেহেরকালী স্টেশনের কাছে।

‘দুজনেই ভাবছি যে, কী করা যায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব, নাকি এগোতে থাকব? এই দ্বিধায় আমরা যখন পরস্পরের মুখোমুখি, তখন একটা মোটর গাড়ি একেবারে আমাদের সামনে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

থেমে গেল। আমাদের সরে পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। একজন অফিসারের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ আমাদের ঘিরে ধরল। ওরা আমাদের দিকে রাইফেল তাক করে রইল। কোমর থেকে রিভলবার বের করার সুযোগ হল না। বোমা ছুঁড়তে হলে আগুন লাগবে। আগুন জ্বালাবার সময় কোথায়? এত নিরুপায় এবং অসহায় আর কখনো নিজেকে ভাবিনি। অক্ষম আক্রোশে শুধুই দাঁত কিড়মিড় করছিলাম। অফিসারের নির্দেশে দুজন পুলিশ আমাদের গায়ের র□্যাপার টান দিয়ে খুলে ফেলল। বোমা এবং রিভলবার কেড়ে নিল। রাস্তার ধার থেকে জল এনে বোমা দুটো ডুবিয়ে রাখল। অফিসারটি আকস্মিক উৎসাহে বলল, "এরা অস্ত্রাগার লুটের মামলার পলাতক আসামি।" তার এত উচ্ছ্বাস দেখে বুঝতে পারলাম, অপ্রত্যাশিত দুটো মস্ত শিকার পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের পোষা কুকুরের যেন খুশির সীমা নেই। আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার বকশিশ হিসেবে ওর কপালে জুটবে পুলিশ সুপার পদে প্রমোশন। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওর খুশির হাসি মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল নিষ্ঠুর হাসির রেখা। শক্ত চোয়ালে পৈশাচিকতা বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। ঝলসাতেই থাকে। আমি ওই দৃশ্য অবলোকন করে ঘৃণায় থুতু ফেলি। আমার মুখ ভরে ওঠে থুতুতে। থুতু দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওদের। সেপাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর। শুরু হয় মারধোর। কিছুক্ষণ পর অফিসারটি মারধোর করতে নিষেধ করে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গা কেটে যায়। ঠোঁট ফেটে গিয়ে রক্ত ঢোকে মুখে। রক্তের স্বাদে উন্মত্ত হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে আমার। ততক্ষণে ওরা হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়। খাঁচাবন্দি বাঘের মতো তখন আমার অবস্থা। মোটর গাড়ি কুমিল্লার দিকে ছুটতে শুরু করে।

'আমাদের যখন মোটরে ওঠানো হচ্ছিল তখন অফিসারের দেহরক্ষী হঠাৎ বলে ওঠে—"এরা তারিণী মুখার্জিকে মারতে যায়নি স্যার, আসলে মারতে গিয়েছিল ক্রেইগ সাহেবকে।"

অফিসার হা-হা করে হেসে ওঠে। বলে, "বেচারা তারিণী মুখার্জি। ক্রেইগকে মারা কি এতই সহজ? ওদের বাবারা পারবে না। আর এরা তো চুনোপুঁটি।"

'অফিসারের কথায় আমার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। শুধু ভাবছিলাম যে, ক্রেইগ ওই কামরায় ছিল আর আমরা মারতে পারলাম না! এত বড়ো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল? এই ভুলের খেসারত কি আর পুষিয়ে দিতে পারব? যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতাম যে, ক্রেইগ কামরায় ছিল, তাহলে অন্তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বোমা মেরে...না, ভাবতে ভালো লাগছে না। ধরা পড়ার এতক্ষণ পর প্রচণ্ডভাবে মন খারাপ হয়ে গেল। আপশোস ও দুঃখে হৃদয় তখন তোলপাড় হচ্ছে। সাঁই সাঁই করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। পেরিয়ে যাচ্ছে চিরচেনা মাঠ-ঘাট-গ্রাম। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সব ঝাপসা। তলিয়ে আছে অন্ধকারে। আমি অন্ধ হয়ে গেছি। আমি বধির হয়ে গেছি। আমার কান আর কোনোদিন কোনো শব্দ শুনবে না। আমার অনুভূতি নিষ্ক্রিয়। পাথর হয়ে থাকা ছাড়া আর আমার আর কিছুই করার নেই। মোটর গাড়ি তখন ঝড়ের বেগে ছুটছে। ওরা যেন আমাদেরকে নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে দিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। কখনো রাস্তা চওড়া, কখনো সরু, কখনো আঁকাবাঁকা, ঝোপঝাড়, খেত, দুপাশে গাছের সারি—মোটর গাড়ি উদ্দাম ছুটছে। এই গতির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই—আমি থেমে আছি। দুঃখের সঙ্গে ব্যর্থতার গ্লানি যখন যুক্ত হয়, সেটা হয় আরো ভয়াবহ। এই দুই তীব্র অনুভূতির পাথরের নীচে আমি এক মহাকালের ফসিল।

'বিকেল পাঁচটায় কুমিল্লা শহরে এলাম। অফিসার আমাদের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মি মারের বাংলোয় নিয়ে এল। মি মারের চোখ ধক্ ধক্ করছে—যেন পারলে গুলি করে মারে—হয়তো তাও নয়, নিজের হাতে টুকরো টুকরো করতে চায়। হাত দুটো গলার পাশে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলানোর ইঙ্গিত করল। পারলে এই মুহূর্তে ও একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে ফেলত আমাদের জন্য। তারপর অফিসারকে নির্দেশ দেয় আমাদেরকে ডিআইবি হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

'মি স্টিভেন্স আমাদের জবানবন্দি নেওয়া শুরু করল। প্রথমে আমার পালা।

"রিভলবার কি আপনার?"

"না।"

"কোথায় পেলেন?"

"আমি তো বলেছি ওটা আমার নয়।"

"বোমা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

“আমি জানি না।”

“আপনারা কোথা থেকে আসছিলেন?”

“হাজিগঞ্জ থেকে।”

“কোথায় যাচ্ছিলেন?”

“মেহেরকালী স্টেশনে।”

“কে আছে ওখানে?”

“আত্মীয়।”

“মিথ্যা বলছেন?”

আমি চুপ করে থাকি।

“প্রত্যেক স্টেশন থেকে খবর পেয়েছি যে, লাল ও নীল র□্যাপার গায়ে দুজন যুবক চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারাই সে দুজন যুবক। অস্বীকার করবেন কি?”

‘আমি জবাব দিতে পারিনি। মুহূর্তে বুঝে যাই যে, আমাদেরকে পরিকল্পিতভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই লাল এবং নীল র□্যাপারই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ওদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া অবান্তর। মৃত্যু অবধারিত। তাই চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওরা আমাদের কাছ থেকে যেন কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক হয়ে রইলাম। সে জন্য সব প্রশ্ন অস্বীকার করা জরুরি।’

“বলুন, অস্বীকার করবেন কি?”

“আমার মতো লাল র□্যাপার আরো অনেকেই গায়ে দিতে পারে। আমি তা কী করে জানব?”

“আপনারা চাঁদপুর থেকে আসছেন?”

“না, আগেই বলেছি হাজিগঞ্জ থেকে।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

স্টিভেন্স কঠোর চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, “স্বদেশি দলে কবে ঢুকেছেন?”

“আমি স্বদেশি নই।”

“কে আপনাদের হত্যাকান্ডের নির্দেশ দিয়েছে?”

“আমরা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত নই।”

“বোমা এবং রিভলবার কি মিথ্যা?”

‘আমি চুপ করে থাকি। সিদ্ধান্ত নেই যে আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না। এরপর স্টিভেন্স যতগুলো প্রশ্ন করেছে আমি জবাব দিইনি।

‘সন্ধ্যার একটু আগে আমাদেরকে কুমিল্লা জেলে ঢোকানো হয়। ঢোকাবার আগে আমাদের দুজনেরই ধুতি খুলে নেয় ওরা। ওদের ভয়, পাছে ধুতিতে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করি। কিন্তু ওরা তো জানে না, অমন কাপুরুষের মৃত্যু আমরা বরণ করব না। আমাদের সামনে রয়েছে পুরো দেশ। আমরা বীরের মতো মরব। ফাঁসির দড়ি হাসিমুখে গলায় নেব। কাকে আমাদের ভয়? কীসের ভয়? ওদের এমন সাবধানতা দেখে আমাদের হাসি পায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের দুজনকে আলাদা সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাইরের পৃথিবীর সব আলো। এখন থেকে আমার এক নতুন জীবনের শুরু।’

প্রীতিলতা খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে, ‘বলতে পারেন, মানুষের জীবন কতবার নতুন করে শুরু হয়?’

‘কতবার? হ্যাঁ অনেকবারই হতে পারে। যদি বাঁক বদলের জন্য বড়ো মূল্য দিতে না হয়।’

‘আপনার কি মনে হয়, আপনার জীবন আর একবার নতুন করে শুরু হতে পারে?’

রামকৃষ্ণ গভীর চোখে প্রীতিলতার দিকে তাকায়। তারপর মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ‘জানি না।’ মনে মনে বলে—প্রীতিলতা, বড়ো দুঃসময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হল।

প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের উত্তর শুনে বোঝে যে, রামকৃষ্ণ ওর উত্তর এড়িয়ে গেল। একটুক্ষণ থেমে ও বলে, ‘তারপর?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তারপর? একজন মানুষের ব্যর্থতার গ্লানি ছাড়া আর কী থাকতে পারে?’

বড়ো তিক্ত শোনায় রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর।

‘তবু শুনতে চাই। তবু বলতে হবে। আমার জন্যও তো এ এক নতুন শোনা। এ তো মায়ের কাছ থেকে রূপকথা শোনা নয়। ইচ্ছে করলেই কি আপনার মতো একজন মানুষের কথা শোনা যায়?’

‘উঁহু তা নয়। আগ্রহটা দু-তরফের। আমারও তো বলতে ভালো লাগছে। আপনার কণ্ঠে ‘তারপর’ শুনলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কেবলই মনে হয়, যে ভুল করেছি, সে ক্ষতি আর পুষিয়ে নেবার সময় নেই।’

‘ঠিক আছে, আমি আর ওই শব্দটি বলব না।’

‘না, বলবেন। কারণ তারপরও তো তারপর থাকে।’

রামকৃষ্ণ ম্লান হাসে। ওর দৃষ্টি ঝিমিয়ে আসে। বলে, ‘সেই রাতে সেলের একধারে কম্বল দুটো পেতে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসে না। মাথা দপদপ করে। কেবলই মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তারিণী মুখার্জি! একটু অপেক্ষা করলেই তো ক্রেইগ বেরিয়ে আসত। হত্যার পরও যদি জানতাম যে, ক্রেইগ কামরায় আছে, তা হলে তো সেখানে ঢুকে পড়তাম। আর মনে হল ধরাও পড়লাম বোকামির জন্য। কেন যে চট্টগ্রামে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম? চট্টগ্রাম ফিরতে দেরি হলে তো ক্ষতি ছিল না। দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারতাম। দুদিন পরে চট্টগ্রাম ফিরলেই হত। ধরা না পড়লে তো ক্রেইগকে খুন করার আর একটা সুযোগ পেতাম। ভাবতেই মাথা খালি হয়ে যায়। চোখের সামনে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি।

‘রাত কত হবে জানি না। বাইরে একটা প্যাঁচা ডাকছিল। ঘুম ভেঙে যায় দরজা খোলার শব্দে। সেলের দরজা খুলে রক্ষীরা আসে। ধুতিটা এগিয়ে দিয়ে পরতে বলে। দ্রুত ধুতি পরে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় যেতে হবে?” রক্ষীরা কোনো জবাব দিল না। পাশের সেল থেকে কালীপদকেও বের করে আনল। নিঃশব্দে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে এলাম। জেল গেটের পাশে জেল সুপারের কামরা। সেখানে আমাদের ঢোকানো হল আলাদা আলাদা করে। দুজন সাহেব বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ছিল। একজনকে চিনলাম। তিনি চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মি সুটার। অন্যজনকে চিনতে পারলাম না। কে জানে ওই লোকটা ক্রেইগ কি না। ভাবতেই হাতটা নিশপিশ করে উঠল। সুটার বাংলায় আমাকে নামধাম জিজ্ঞেস করে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করল। দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিলাম। অনেক প্রশ্নে চুপ করে থাকলাম। কোথায় যাচ্ছিলাম জিজ্ঞেস করায় বললাম, চাকরির খোঁজে কলকাতা যাচ্ছিলাম। কিন্তু প্রশ্নের শেষ নেই। কারণ ওদের তো আসামি খুঁজে বের করতে হবে। আমার তো এসব বালাই নেই। ওদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিরর্থক। আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। এক পর্যায়ে বললাম, "আমি আর তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব না। এসবকিছুই আমার কাছে অর্থহীন।" শেষ পর্যন্ত আমাকে আবার সেলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। দেয়াল ঘড়িতে দেখে এসেছিলাম রাত তিনটে। প্রাণপণে ঘুমোতে চাই। ঘুমোলে আমার স্নায়ু ঠান্ডা হবে। কিন্তু না, ঘুম এল না। বাকি রাতটুকু শুয়ে-বসে পায়চারি করে কাটিয়ে দিলাম।

'ভোরে হাতমুখ ধোয়ার জন্য কিছুক্ষণের জন্য সেল থেকে বেরুতে দিল। স্নিগ্ধ বাতাসটুকু গায়ে লাগতেই আমার প্রিয় একটি গান মনে এল। গুনগুনিয়ে গাইলাম, 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।' গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভীষণ হালকা মনে হল। মনে হল, কীসের গ্লানি? আমাদের কোনো ব্যর্থতা নেই—আমাদের ব্যর্থতাও সফল। আমরা তো অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করছি। মুখ ধোয়ার ফাঁকে কালীপদের সঙ্গে দেখা হলো। ও একটু অবাক হয়ে বলল, ভোরবেলা তোমার মুখে এই গান?"

হেসে বললাম, "ভালো লাগল তাই গাইলাম। ঘুম হয়েছে তোমার?"

ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "সামান্য।"

তারপর রসিকতা করলাম, "কেমন লাগছে শ্বশুরবাড়ি?"

ও হেসে জবাব দিল, "কেমন আবার? মধুর হাঁড়ির মতো।"

'দুজনে মন খুলে হাসলাম। রক্ষীরা আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। তারপর আবার বন্দি করল আমাদের। খাওয়ার সময় সেলের দরজা সামান্য সময়ের জন্য খোলা হয়। বাকি চব্বিশ ঘন্টা বন্ধই থাকে। তাই কালীপদের সঙ্গে তেমন কথাবার্তা হয় না। ভোরবেলা টিফিনের জন্য দুটো শুকনো রুটি আর গুড় দিয়ে গেল। প্রচণ্ড খিদে ছিল, তাই কোনো আপত্তি না করে খেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নিলাম। কিন্তু দুপুরবেলা লোহার থালায় করে খাবার নিয়ে এল। লোহার থালা আর খাবারের চেহারা দেখে ঠিক করলাম যে এ খাবার খাব না।

'চেঁচামেচি করে বললাম, "নিয়ে যাও এ খাবার। এগুলো কি মানুষের জন্য রান্না হয়েছে? যাও, ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এস। ওখানে কাক আর কুকুরে ভাগ করে খাবে।"

'এ খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জমাদারসহ জেলার ছুটে এল। দেখলাম বেশ তটস্থ।

জেলার বলল, "না না, এ থালা আপনাদের জন্য নয়।"

'তারপর মেটকে ধমকাল। বেশ মজাই পাচ্ছিলাম জেলারের আচরণে। তার সামনেই গাইলাম, 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী।' চমকে আমার মুখের দিকে তাকাল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার চেহারা। বলল, "আপনাদের খাবার অন্য জায়গা থেকে এক্ষুনি নিয়ে আসা হচ্ছে। প্লিজ একটু অপেক্ষা করুন।"

'ওরা সবাই চলে গেলে অনেকক্ষণ শিস বাজালাম। ভালোই লাগছিল। নির্ভার হয়ে যেতে পারা এক ধরনের চমৎকার আনন্দ। একটু পর খাবার এল। বেঙ্গল জেলগুলোতে সদ্য প্রচলিত অ্যালুমিনিয়ামের থালায় করে খাবার দিয়েছে। খাবারের মানও আগের চেয়ে ভালো। বেশ মনোযোগ দিয়েই খাবার খেলাম। কিছুটা তৃপ্তি যে ছিল না তা নয়। কারণ, হিসেব করে দেখলাম প্রায় বাষট্টি ঘণ্টা পর পেটে ভাত পড়ছে। মাছে-ভাতে বাঙালি আমরা। ভাত না খেতে পারলে ভালো লাগে না। তাই সেদিনের সেই অরুচিকর ভাতটুকু অমৃত মনে হয়েছিল।

'বিকেলে স্টিভেন্স এল। বলল, "আমাদের ব্যক্তিগত জিনিস ও টাকা-পয়সা নিরাপদে রাখা হয়েছে। যদি কোনো কিছু কিনতে হয় তো আমরা কিনতে পারব।"

'মুখে বললাম, "প্রয়োজন নেই কোনোকিছুর।" মনে মনে বললাম, টাকা-পয়সা তো সামান্য জিনিস। জীবনের বিনিময়ে কিনতে চাই তোমাদের রক্ত। ঘরে ওঠাব স্বাধীনতা।

'স্টিভেন্স হয়তো আমার মুখ দেখে কিছু আঁচ করে থাকবে। বলল, "আর কিছু বলবে?"

বললাম, "না।"

'স্টিভেন্স চলে যায়। একদিন দু-দিন করে আমাদের সময় কাটে। খাওয়া ও স্নানের সময়টুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ছাড়া বাকি সময়টা সেলের ভেতর বন্দি। সেলের বাইরে চারদিকে উঁচু দেয়াল। রোদ-ভরা দিনের আলো দেখতে পাই না। কখন সন্ধ্যা হয় টের পাওয়া মুশকিল। কারণ, দিনগুলো ছিল মেঘলা দিনের মতো। যেন আকাশ-ভরা মেঘ। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে। আর রাত? রাতগুলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেন প্রেতপুরী, এসব জায়গায় মানুষ থাকে না। কয়দিন পর ম্যালেরিয়ায় পড়লাম। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে দুহাতে লোহার শিক চেপে ধরতাম। মাথা ভার হয়ে ঘোরের মতো লাগলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। জেলের ডাক্তার আসত। ওষুধ দিত। ভালো হয়ে যেতাম। আবার জ্বর আসত।

'দিন আটেক পর একদিন ডাক্তারবাবু চুপি চুপি বললেন, ৭ ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ের তেতলার লিফটে চড়ে তিনজন যুবক জেল ইনস্পেকটর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেছে। আর একজন সাহেব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তিনজন যুবকের দুজন সঙ্গে সঙ্গে বিষপানে মৃত্যুবরণ করেছে। অন্যজন গুলিবিদ্ধ হলেও মারা যায়নি। ওকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে গেছে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তবু তো একজন বেঁচে গেলেন।"

বললাম, "এ বাঁচা তো বাঁচা নয় ডাক্তারবাবু। ওকে বাঁচিয়ে তুলে ইংরেজরা আবার মারবে। কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার জন্যই ওরা বাঁচিয়ে তোলে।"

'ডাক্তারবাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রেখে গেলেন আমার জন্য হতাশা। কেবলই মনে হতে লাগল সিমসন, লোম্যানের সঙ্গে ক্রেইগ মারা গেলে ইতিহাসটা অন্যরকম হত। তিন মাসে তিনজন ইনস্পেকটর জেনারেল মরলে জোরদার হয়ে উঠতে পারত বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলন। শহিদদের বিপ্লবী অভিবাদন জানালাম। বারবার নিজের কপাল ঠুকলাম দরজার লোহার শিকে।

পরদিন কালীপদ জিজ্ঞেস করল, "কপাল ফুলেছে কেন? কী হয়েছে?"

বললাম, "কপালটা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলাম। পারলাম না।"

"কী যে পাগলামি করো!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কালীপদ আমাকে মৃদু ধমক দেয়। আমি হাসি।

‘দুদিন পর বিকেল চারটায় আমাদেরকে সেল থেকে বের করা হল। জেলগেটের সামনে খোলা জায়গায় নিয়ে এল আমাদের। যে কারণেই বের করা হোক না কেন, সেল থেকে বেরুতে পারলেই আমি খুশি। আর কিছু না হোক নীল আকাশটা দেখা যায়, সবুজ গাছ দেখা যায়। আশপাশের মানুষের কথা শোনা যায়। রাতদিন বন্দি থাকার ফলে বুঝতে পারছি, এগুলো আমার এক বিপুল আনন্দ। আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমি কৈশোরে ফিরে যাই, বালক হয়ে উঠি। ওই খোলা জায়গায় শ-খানেক কংগ্রেস ভলান্টিয়ার ছিল। বুঝলাম আমাদের শনাক্তকরণের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে আমাদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। দেখলাম অল্প সময়ে শনাক্তকারীরা আমাদের শনাক্ত করল। ষষ্ঠ ব্যক্তি যিনি এলেন, তাঁকে দেখে মনে হল কোথায় যেন দেখেছি। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল যে ইনি চাঁদপুর স্টেশনের টিকিট কালেক্টর। পুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের টিকিট নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের মুখের দিকে তেমন করে তাকালেন না।

পাশ থেকে একজন খোঁচা দিল—“কী রজনীবাবু চিনতে পারলেন না?”

“না, কাউকেই চিনতে পারছি না।”

“তাহলে এরা কি বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছিল?”

‘আমি রজনীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। উনি আমাদের কাছ থেকে যখন টিকিট নিচ্ছিলেন, তখন আশপাশে কেউ ছিল না। আমাদের না চেনার কথা নয়। তবু তিনি চিনতে পারলেন না কেন?

“রজনীবাবু, চুপ করে আছেন যে?”

“আমি তো বললাম ওদের চিনি না। আপনি কি জোর করে চেনাবেন?”

‘আমি এবং কালীপদ পরস্পরের দিকে চাইলাম। কালীপদের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি না দেখার ভান করে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। শনাক্তকরণ শেষ করে আমাদের যখন সেলে নিয়ে আসছিল তখন আমি কালীপদের হাত চেপে ধরলাম। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কি রজনীবাবু আমাদের চেনেনি?”

কালীপদ একই ভঙ্গিতে বলল, “সব ভান।”

“আমারও তাই মনে হয়েছে।”

‘অকস্মাৎ গভীর আনন্দে বুক ভরে গেল। সেলের দরজা বন্ধ করলে কী হবে, আমার মনের দরজা সব খুলে গেল। রজনীবাবুদের মতো অনেকে আছে যাদের মনে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। মাভৈ! আমাদের ভয় কী! সেদিনই প্রথম রাত, যেদিন আমি গভীর ঘুম ঘুমালাম।’

তখন সেপাই এসে দাঁড়াল—‘দিদিমণি আপনার সময় হয়ে গেছে।’

‘সময় হয়ে গেছে? উহ্, কেন সময় হয়ে যায়!’

প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের দিকে তাকায়। রামকৃষ্ণ বলে, ‘আমরা চাই না বলেই সময় হয়ে যায়।’

‘চলে যেতে কিছুতেই মন চায় না।’

রামকৃষ্ণ আগ্রহ ভরে বলে, ‘আবার আসবেন তো?’

‘আসতে তো আমাকে হবেই।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ।’

দুজনের চোখের ভাষা গভীর, ব্যাপক এবং নিবিড় হয়ে থাকে। আর কণ্ঠস্বর? দুজনের কানেই দুজনের কণ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি হয়ে আছড়ে পড়ে। অনুরণিত হয়ে যায় হৃদয়ের তন্ত্রীতে। ফিরে আসতে হয় প্রীতিলতাকে। ফিরে আসতে হয় জেলখানার চার দেওয়ালের মধ্যে আবেগের শেষ নির্যাসটুকু জমা রেখে। রামকৃষ্ণ ওই নির্যাসটুকু বুকে নিয়ে অপেক্ষা করে। প্রীতিলতা যতক্ষণ চলে যেতে থাকে ও তাকিয়ে থাকে। মনে হয় জেলখানার ঘণ্টাধ্বনির মতো প্রচণ্ড ঢং ঢং শব্দ প্রীতিলতা। প্রীতিলতা পা ফেললেই রামকৃষ্ণের বুকের ভেতর সে শব্দ বাজে। রামকৃষ্ণ আনমনা হয়ে যায়। ভাবে, আর কটা দিনই বা বেঁচে থাকা। কী হবে এই আড়ালটুকু রেখে? জেলখানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থমকে যায় প্রীতিলতা। আমি তো চাই রামকৃষ্ণের নতুন জীবন শুরু হোক। দুজনেই ঠিক করে ফেলে, আগামী সাক্ষাৎকারটি হবে একদম অন্যরকম। মৃত্যুকুঠুরির মানুষের সঙ্গে খোলা পৃথিবীর মানুষের ভালোবাসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বুকভরা আনন্দ নিয়ে হোস্টেলে ফিরে আসে প্রীতিলতা। সারা রাস্তায় ও অনেক কথা ভেবেছে। যেদিন মাস্টারদা ওকে দলের সদস্য হবার অনুমতি দিয়েছিল, সেদিন ঠিক এমনই আনন্দ পেয়েছিল ও। যেদিন বিশ টাকা বৃত্তি পেয়ে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিল, সেদিনও এমন আনন্দ হয়েছিল। গভীর আনন্দ হয়েছিল ১৯৩০-এর ১০ এপ্রিল যখন ওদের হোস্টেলে কলকাতার বিশিষ্ট দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকার সান্ধ্যকালীন বিশেষ সংখ্যা আসে। সব মেয়েরা ভিড় করে ওই পত্রিকার ওপর ঝুঁকে পড়ে। গভীর বিস্ময়ে আনন্দে ও দেখেছিল প্রথম পাতা জুড়ে এক বিরাট শিরোনাম : 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস—রিজার্ভ পুলিশ লাইন অধিকার।' এমন একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা! জীবনের এইসব ঘটনা থেকে রামকৃষ্ণকে ভালোবাসা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এক চমৎকার ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতা জীবনের সুতো। ও গুনগুনিয়ে গায়—'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।' গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে দেখে পিসিমা বসে আছে। পিসিমাকে দেখে চমকে ওঠে প্রীতিলতা। পিসিমার মুখ শুকনো, চোখে উদ্বেগ তবু মুখে হাসি টেনে বলে, 'কেমন আছিস, প্রীতি?'

'ভালো পিসিমা। তুমি কেমন আছ?'

'শরীরটা ভালো নেই।'

'কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু নয়। এই আর কি!'

'চা খাবে? চা বানাই?'

'না রে চা থাক। তোর জন্য অনেকক্ষণ বসে রয়েছি। কোথায় গিয়েছিলি?'

'জেলখানায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘শুনলাম তুই নাকি খুব ঘনঘন যাচ্ছিস?’

‘হ্যাঁ। তুমিতো জানো আমি ওর আরতি নামের বোন।’

‘কাজটা কি ভালো করছিস?’

‘আমার না গিয়ে উপায় নেই পিসিমা।’

প্রীতিলতা পিসিমার পায়ের কাছে বসে কোলে মুখ রাখে। পিসিমা ওর মাথায় হাত রাখে।

‘তোর কী হয়েছে বল তো?’

প্রীতিলতা মাথা সোজা করে বলে, ‘রামকৃষ্ণকে আমি ভালোবাসি।’

‘প্রীতি!’

‘কোথাও কোনো মিথ্যে নেই পিসিমা।’

‘ওই মরণ-কুঠুরিতে’—

‘না পিসিমা, মরণকুঠুরি নয়। ভালোবাসার কোনো মরণ-কুঠুরি থাকে না।’

‘তুই কি এভাবে মরবি হতভাগি?’

প্রীতিলতা কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। একরাশ চুল পিঠের ওপরে লুটোয়। ফোঁপানির কারণে আন্দোলিত হয় পিঠ। পিসিমা স্তব্ধ হয়ে থাকে। বুঝতে পারে না যে, এমন সর্বনাশের ডাক কেন প্রীতিলতার হৃদয়ে।

‘ওঠ্ প্রীতি, মুখ মুছে নে।’

প্রীতিলতা আঁচলে মুখ মুছে শান্ত স্বরে বলে, ‘পিসিমা আমাকে একটা কথা দাও।’

‘কী?’

‘আমাকে একটা জিনিস দিতে হবে।’

‘বল না, কী?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আমাকে রামকৃষ্ণের একটা ছবি জোগাড় করে দেবে?’

‘কোথায় পাব?’

‘তুমি চেষ্টা করলেই পাবে।’

পিসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ‘দেখি।’

‘তুমি দেখি বললেই হবে জানি। ওর একটা ছবি না পেলে আমি মরে যাব।’

‘মরণের আর বাকি রাখলি কি? আমি আবারও বলছি কাজটি তুই ভালো করিসনি। যে যাবার সে তো যাবে। তোর জীবন তো অনেক বড়ো প্রীতি। সামনে আমাদের অনেক লড়াই। দেশকে মুক্ত না করে আমরা থামব না।’

‘পিসিমা, আমি ছেলেমানুষ নই। আমি তো নিজে বিপ্লবী হবার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। সুটকেসের ভেতরে লুকিয়ে বোমার খোল কলকাতা থেকে নিয়ে যাচ্ছি চট্টগ্রামে। সেই খোলের ভেতর বোমা তৈরি হয়। বিপ্লবী কার্যক্রমে সেই বোমা ব্যবহৃত হয়েছে পিসিমা। তুমি কেন আমাকে জীবনের ভয় দেখাচ্ছ? জীবন কি আমার হাতের মুঠোয় নয়?’

পিসিমা প্রীতিলতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে যে, ওর এতদিনের চেনা প্রীতিলতা নয়। এ মেয়ে বদলে গেছে। ও নিজেই এখন বোমার খোল। ভেতরে প্রেমের বারুদ ঠাসছে। পিসিমার কি সাধ্য আছে যে, এই মেয়েকে উপদেশ দেবে?

‘দেখছ কী পিসিমা? অবাক হয়েছ?’

পিসিমা মাথা নেড়ে বলে, ‘না।’

‘তবে কি দুঃখ পেলে পিসিমা? তোমার তো দুঃখ পাওয়া উচিত নয়।’

‘আমি দুঃখও পাইনি। বুঝতে পেরেছি যে, তোর বিবেচনা আমার চেয়ে অনেক বেশি। ঠিক আছে যাই। তোর জন্য ছবি জোগাড় করতে পারলে খবর দেব।’

পিসিমা ধীর পায়ে চলে যায়। প্রীতিলতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখে। তারপর ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ গাইতে গাইতে ঘরে ঢোকে। ঘরের মাঝখানে কোমরে দু-হাত দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দাঁড়িয়ে থাকে ও। কেমন করে সময় চলে যায়, বেলা চলে যায়। তোশকের নীচ থেকে ডায়রিটা টেনে বের করে। চট্টগ্রামে থাকতে বিপ্লবী দলের গোপন এবং প্রকাশ্য কাজে যুক্ত হয়েছিল। ছাত্রীদের শিক্ষিত করার জন্য পাঠচক্র গঠন করেছিল। বাজেয়াপ্ত বইগুলো ওদের পড়তে দিত। দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করত। কেউ কেউ সোনার গয়নাও দিয়ে দিত। 'জেলা ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন' আয়োজিত হয়েছিল। কী প্রবল উত্তেজনা ছিল সেই সময়ে! মাস্টারদা বলতেন, আমাদের টাকার দরকার। অস্ত্রের জন্য টাকা। দু-চারটি ডাকাতি করে স্বাধীনতা আসবে না। সবাই মিলে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। অস্ত্রাগার আক্রমণ করার আগে টাকা সংগ্রহের তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। সে সময়ে কম করে হলেও পনেরো হাজার টাকার খুব দরকার ছিল। সে সময়ে বিপ্লবের কাজে সরাসরি যুক্ত হওয়া এবং দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব ছিল ছেলেরা। স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেরা বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দিল। দু-হাজার তিন হাজার করে। কেউ কেউ মা বা বোনের সোনার গয়না এনে দিল। কয়েক দিন পরে একটি ছেলে এসে মাস্টারদার সামনে কান্নাকাটি করল। কান্না থামিয়ে এক সময় বলল, আমি সরাসরি কাজে যুক্ত হতে চাই। কিন্তু আপনারা আমাকে নেবেন না। কারণ আমি টাকা জোগাড় করতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। আমার মায়ের কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই। কাল রাতে আমি মায়ের বাক্স ভেঙে এই ভাঙা রূপার বালাটি পেয়েছি। এতে দু-চার টাকা পাওয়া যাবে কি? এই বলে বালাটি বের করে ও আবার কাঁদতে শুরু করে। মাস্টারদা ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ওর দাবি সবার আগে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ডাকে সাড়া দিয়ে যতীন্দ্রমোহন ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। সেদিনকার সভায় দেশবন্ধু অনলবর্ষী বক্তৃতায় স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করেন। কলেজের সহ-অধ্যক্ষের চাকরি ত্যাগ করেন নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী ওই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলেজের সারদা দফতরি তার বারো টাকা বেতনের চাকরি ত্যাগ করে। সেদিন সভামঞ্চে দেশবন্ধু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, সাড়ে সাতশত টাকার চাকরি ছাড়ার চেয়ে বারো টাকার চাকরি ছাড়া অনেক বেশি মহত্তর কাজ। কী প্রবল উত্তেজনা ছিল শহরের বুকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভাবতে ভাবতে প্রীতিলতা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে অবস্থিত এই ছাত্রী-নিবাস এখন ওর প্রিয় জায়গা। যতদিন রামকৃষ্ণ এই শহরে আছে, ততদিন ও থাকবে। তারপর? নিজেকে প্রশ্ন করে ও হেসে ফেলে। শব্দটি ও এখন খুব ঘনঘন ব্যবহার করছে। বলতে ভালো লাগে। রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর মায়াবী হয়ে ছুটে যায় তেপান্তরের মাঠে। ওই শব্দটি না বললে একজন মানুষের পিছে ছোটো যায় না। যে মানুষ পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে পেরিয়ে যায় তেপান্তরের মাঠ। রামকৃষ্ণ তো এখন ওর রূপকথার নায়ক। ও ছোট্ট খুকি হয়ে 'তারপর' বলে। তারপর কী হবে? কী হবে তা মনে মনে ভেবে রেখেছে, সেটাই হতে হবে। চট্টগ্রামের সেইসব দিনগুলোতেই তো ও ভেবে রেখেছিল, দেশের স্বাধীনতার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মদান একটি পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। তখন ওদের ডায়রি লিখতে হত। নিজের ট্রাংক থেকে সেই ডায়রিটা বের করে ও। প্রতিদিনের কত অসংখ্য ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি শব্দের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়ে আছে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে ওর দৃষ্টি আর নড়ে না। ও ডায়রির পৃষ্ঠা মেলে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। লিখেছিল, 'কোন্পথে জীবনকে আমি ভাসিয়ে দিলাম? এই তো আমার টেবিলের সামনে রাধাকৃষ্ণের ছবি। এই প্রেম স্বর্গীয়। এমনভাবেই মাতৃভূমিকে আমার ভালোবাসতে হবে। অন্য কোনো প্রেম-ভালোবাসা আমার হৃদয়ে স্থান পাবে না। রাধার মতোই আমার দেশপ্রেম আমি উজাড় করে ঢেলে দেব, নিজেকে নিঃশেষে আমি দান করে যাব।' অক্ষরগুলো প্রীতিলতার চোখের সামনে রঙিন হয়ে যায়। ভাবে, দু-বছর আগে যা লিখেছিলাম, তা কি আমি এখনো সত্য বলে জানি? হাঁ জানি। একজন ফাঁসির আসামির সঙ্গে প্রেম তো স্বর্গীয়। সে প্রেম রাধাকৃষ্ণের প্রেম, সেখানে কোনো অন্যায় নেই। ও তো কৃষ্ণ। আমি রাধা হয়ে ওর জন্য আমার দেশপ্রেমই উজাড় করে দিচ্ছি। প্রীতিলতা ডায়রির পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো বড়ো বড়ো করে 'রাধাকৃষ্ণ' লিখে ভরে ফেলে। যেন এ এক অন্তত পিপাসা, কিছুতেই ফুরোয় না তৃষ্ণা।

ঘরে কুমুদিনী কখন প্রবেশ করে ও টের পায় না। কুমুদিনী ওর পিঠের ওপর দিয়ে ঝুঁকে 'রাধাকৃষ্ণ' লেখা দেখে প্রীতিলতার পিঠে দুম করে কিল বসিয়ে দেয়।

'ব্যাপার কী? এমন মগ্ন হয়ে রাধাকৃষ্ণের ধ্যান করছিস?'

'কারণ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম স্বর্গীয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘ছেঁদো কথা রাখ। কোথায় মন দিয়েছিস তাই বল?’

‘এতদিনেও জানিস না?’

প্রীতিলতা মিটিমিটি হাসে। কুমুদিনী ওর গা ঘেঁষে ঘন হয়ে বসে—‘খুলে বল তো কী? মনে হচ্ছে কোথাও কিছু ঘটিয়েছিস?’

‘ভাবিনি তোকে এত খুলে বলতে হবে। যেদিন দীপালি সংঘের সদস্য হলাম, সেদিন থেকেই তো প্রেমের শুরু। নতুন আর কী? জানিস না? আমার প্রেম তো দেশপ্রেম।’

কুমুদিনী ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, ‘ওই প্রেম তো আমাদের সবারই আছে। আমিও ওই সংঘের সদস্য হয়েছিলাম। আমি বিপ্লবী প্রীতিলতার প্রেমের কথা শুনতে চাইনি। যুবতী প্রীতিলতার প্রেমের কথা বল।’

প্রীতিলতা সোজা হয়ে বসে কুমুদিনীর চোখে চোখ রেখে বলে, ‘আমি রামকৃষ্ণকে ভালোবাসি।’

‘প্রীতি!’

কুমুদিনীর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে বাজে প্রীতিলতার কানে। বলে, ‘অবাক হচ্ছিস কেন? আর কদিন পর মরে যাবে সেজন্য?’

কুমুদিনী স্তব্ধ হয়ে থাকে। প্রীতিলতা কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বলে, ‘মরে যাবে বলেই আমি ওকে ভালোবাসি। একজন বিপ্লবীই পারে একজন বিপ্লবীকে ভালোবাসতে। ও স্বাধীনতার জন্য মরতে পারছে, আর আমি ওকে ভালোবাসতে পারব না কুমুদিনী?’

কুমুদিনী চুপ করেই থাকে। প্রীতিলতা বলে, ‘তুই আমি যেদিন থেকে বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, তারপর থেকে অনেক দীক্ষা নিয়েছি। মনে পড়ে প্রতিদিন আমাদের ডায়রিতে লিখতে হত প্রতিদিন বিপ্লবী কাজের জন্য কতটা সময় ব্যয় হল, কোনো মিথ্যা কথা বলা হয়েছে কি না, নৈতিক কোনো দুর্বলতা এসেছিল কি না এবং তা জয় করা হয়েছিল কি না? দেখ, আমি আমার ডায়রিতে এই কথাগুলো লিখেছিলাম।’

কুমুদিনীকে ডায়রির পৃষ্ঠাটা পড়তে দেয় প্রীতিলতা। তারপর বলে, ‘তখন আমি এ কথাগুলো লিখেছিলাম, এখনো আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যা লিখেছিলাম তার থেকে আমি সরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আসিনি। রামকৃষ্ণকে ভালোবাসা আমার নৈতিক দুর্বলতা নয়। নৈতিক অধিকার। আমি যা করছি, ঠিকই করছি। মৃত্যুর আগে ও এইটুকু জেনে যাক যে, নারীর প্রেম ওকে জীবনের শেষ পূর্ণতা দিয়েছিল। ও আমার রামকৃষ্ণ নয়, ও আমার শুধুই কৃষ্ণ। মিথ্যে কথা বলব না বলে, তোর কাছে আমার এই সত্যভাষণ।'

কুমুদিনী একটি কথাও না বলে প্রীতিলতাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, 'তুই আমার তৃতীয় চোখটা খুলে দিলি প্রীতি। তুই অনেক বড়ো। মনে পড়ছে চট্টগ্রামের 'জেলা ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন'-এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হয়েছিলাম। আনন্দে তুই আমাকে সেদিন কী গভীরভাবে জড়িয়ে ধরেছিলি প্রীতি। আমি ভেবেছিলাম প্রথম হতে না পেরে তুই খুব রেগে থাকবি। দেখলাম একদম উলটো। তোকে তো কোনোদিন বলা হয়নি, সেদিন থেকেই আমি ভেবেছিলাম যে, তুই সাধারণ মেয়ে নোস। তুই আমাদের চেয়ে আলাদা। সেদিন থেকে আমি তোকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি। একবয়সী মেয়েকে শ্রদ্ধা করা যায় কি না এ নিয়ে আমার মনে দ্বন্দ্ব ছিল। আজ মনে হচ্ছে, সত্যি শ্রদ্ধা করা যায়। আজ আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই রে। তোকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে ভালো লাগছে।'

'হয়েছে, হয়েছে, আর প্রশংসা করতে হবে না।'

'তোর প্রশংসা করারও যোগ্য আমি নই রে প্রীতি। আসলে কেউ-কেউ থাকে যে উদাহরণ তৈরি করার জন্যই জন্মায়।'

'তুই যদি এভাবে কথা বলতে থাকিস, তা হলে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব।'

'না, তোকে ঘর ছাড়তে হবে না। চল ছাদে যাই। অনেকদিন তোর বাঁশি শুনি না।'

'আমি আবার বাঁশি বাজাতে জানি নাকি? যেটুকু বাজাই, সেটুকু তো মনের আনন্দে।'

'আমিও শুনব, মনের আনন্দে।'

'ভালোই বলেছিস।'

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে প্রীতিলতা। একবার রাস্তার এক বাঁশিওয়ালার কাছ থেকে ও বাঁশিটা কিনেছিল। নিজে নিজেই বাজাতে শেখে। হোস্টেলের মেয়েরা ওর বাঁশি বাজানো শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভালোবাসে। বলে, 'তোর বাঁশির সুর বুক ভার করে দেয়। মনে হয় গভীর বেদনা, প্রচন্ড দুঃখ বাঁশির সুরে ভেসে বেড়াচ্ছে।' বিশেষ করে সরোজিনী পাল তো বাঁশি শুনে কেঁদে ফেলে। ওর চাইতে উপরের ক্লাসে পড়ে সরোজিনী। বিপ্লবী দলের সমর্থক। অনেক রাতে ওর বাঁশি শুনে সরোজিনী বলত, 'প্রীতি থাম। আর যে সইতে পারি না। চল, ঘুমুবি চল।' সরোজিনী ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসত। রামকৃষ্ণের ফাঁসির খবর কাগজে পড়ার পর বাঁশি আর বাজানো হয়নি। এক অস্থির চঞ্চলতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। এখন কুমুদিনীর কথায় মনে হয়, বাঁশিই ওর জন্য সবচেয়ে ভালো আশ্রয়। ভাবে, তমালের ডালে বসে বাঁশি বাজাত কৃষ্ণ। সে বাঁশি শুনে উন্মাদিনী হয়ে যমুনার কূলে ছুটে আসত রাধা। ওর কৃষ্ণের হাতে বাঁশি নেই। বাঁশি এখন রাধার হাতে।

প্রীতিলতা বিড়বিড় করে—'আমি তো রাধাই হয়েছি।'

'কী রে যাবি না?'

'চল।'

টেবিলের ওপর থেকে বাঁশিটা নিয়ে দুজনে ছাদে উঠে আসে। কিন্তু আজ আর বাঁশিতে মন বসাতে পারে না প্রীতিলতা। বারবারই মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সুর কেটে যায়। কুমুদিনী বলে, 'কী হল?'

'ভালো লাগছে না রে।'

'তা হলে থাক।'

'একটা ব্যাপার নিয়ে আমি দিনরাত খুব ভাবছি কুমুদিনী।'

'কী?'

'ছেলেরা যেখানে এমন বীরের মতো প্রাণ দিচ্ছে, সেখানে মেয়েদের কেন এমন সুযোগ দেওয়া হবে না? নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগের কথা অনেকে মুখে বললেও, কাজের বেলায় তাদের কেন বিশ্বাস করা হবে না? বিপ্লবী দল কি এই মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘প্রীতিলতা, পিসিমা তো এ ব্যাপারে আমাদের ধৈর্য ধরতে বলেন।’

‘তিনি আমাকে নেতাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশ করতে বলেছেন। আমি মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইব। আমার বিশ্বাস, আমি তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদানের অনুমতি আদায় করে নিতে পারব।’

‘অস্থির হোস না প্রীতি।’

‘এটা শুধুই অস্থিরতা নয়। এটা আমার বিশ্বাস, আমার কর্মপ্রেরণা। আমি আমার আরাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে চাই।’

কুমুদিনী প্রীতিলতার হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, ‘আমি তো চিনি তোকে। তোর চোখেমুখে যে জ্যোতি ফুটে উঠেছে, তাতে বুঝেছি এ অর্জন করা তোর জন্য সহজ। তুই পারবি।’

প্রীতিলতা পায়চারি করে। বাঁশিটা চেপে ধরে রাখে বুকের কাছে। বলে, ‘যেদিন জালালাবাদ যুদ্ধে তেরোজন শহিদ হলেন সেদিন আমার বুক ফেটে গিয়েছে। অর্ধেন্দুদা ছাড়া কাউকে আমি চিনতাম না। তবু সবাই আমার ভাই। আমি ওদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। পিসিমার গোপন আশ্রয়ে অম্বিকা চক্রবর্তীর চিকিৎসা হয়েছে, তাও জেনেছি অনেক পরে। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য আমাদের সে কথা বলা হয়নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের খবর পাওয়ার পর থেকেই আমি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছি। এতদিন ধরে তো নেপথ্যে কাজ করলাম। ইস্তাহার বিলি, অর্থ সংগ্রহ, কোনোকিছুই বাদ নেই। বিপ্লবী দলে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। আমি চাই আমার আরও কিছু করা উচিত, অনেক বড়ো কিছু।’

‘চল, আগামী কোনো একদিন এসব ব্যাপার নিয়ে পিসিমার সঙ্গে আলাপ করব আমরা।’

প্রীতিলতা চুপ করে থেকে বলে, ‘মাস দুয়েক আগে পিসিমার ওই বাড়ি থেকে আমি কিছুতেই আসতে চাইছিলাম না। বিপ্লবীদের এই আশ্রয়টি আমার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। পিসিমা আমাকে জোর করে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, বিএ পরীক্ষার জন্য লেখাপড়া করতে। পিসিমা চান আমি লেখাপড়া করি।’

কুমুদিনী জোর দিয়ে বলে, ‘হ্যাঁ, পিসিমা একথা আমাকেও বলেছেন। তাঁর মতে, তোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

লেখাপড়ায় ঢিলেমি এসেছে। আমিও বলতে চাই যে, ক্লাসের বাংলা ও দর্শন পরীক্ষায় তুই সবসময় প্রথম হোস প্রীতি। অথচ এখন তোর তেমন মনোযোগ নেই, সেদিন ক্লাসে ম্যাডামও সেকথা বলছিলেন।'

'এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না কুমুদিনী। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল বিপ্লবী কাজ। অনুজা সেন বিপ্লবীদের তৈরি নতুন এক ধরনের বোমা নিক্ষেপ করেছিল টেগার্টের গাড়ির ওপর, ডালহৌসি স্কোয়ারে। বোমার সলিতা কিছু ত্রুটিপূর্ণ থাকায় বিস্ফোরণে অনুজা সেন ঘটনাস্থলে মারা যায়। তুই ভেবে দেখ কুমুদিনী ওই মৃত্যুর চেয়ে আমার পড়ালেখা কি জরুরি? এই শহরে টেগার্ট ঘুরে বেড়াবে, আর অনুজা সেনদের মৃত্যু ব্যর্থ হয়ে যাবে—এ আমি ভাবতেই পারি না। ভেবে দেখ, গোপীনাথের ফাঁসির কথা? দেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সকল আবেদন অগ্রাহ্য করে ইংরেজ সরকার ওকে ফাঁসি দিল। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। মাতৃভূমির পরাধীনতার শিকল আমরা কবে ভাঙতে পারব, এই এক চিন্তা সারাক্ষণ আমাকে কুরে কুরে খায়। কী হবে আমার পড়ালেখা দিয়ে? কী হবে ভালো রেজাল্ট দিয়ে? একজন মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত ভালো কিছু অর্জন কি পরাধীন দেশের জন্য জরুরি?'

'বুঝতে পেরেছি তুই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিস। আমি নীচে যাই। তুই বরং কিছুক্ষণ বাঁশি বাজা।'

'কুমুদিনী কিছুদূর যেতেই পিছুডাকে প্রীতিলতা।'

'কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ, শোন, ক-দিন পরে রামকৃষ্ণ ফাঁসিকাঠে ঝুললে অর্থহীন আমার পড়াশোনা। বিপ্লবীদের এইসব মৃত্যুকে মেনে নিয়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন আমি কখনোই দেখতে পারব না কুমু। তোকে এটা জানিয়ে রাখলাম।'

'এসব ভাবার সময় আছে প্রীতি। তুই মাথা ঠান্ডা কর।'

কুমুদিনী দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। প্রীতিলতা ওর পলায়ন দেখে মনে মনে হাসে। ভাবে, একজন বিপ্লবীকে ভালোবাসার জন্য তো ডেথ-সেলই উপযুক্ত জায়গা। এর চাইতে মহৎ স্থান আর কীই-বা হতে পারে। ও বাঁশি তুলে ফুঁ দেয়। পরক্ষণে থেমে যায়। বলে, এখন আকাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

লক্ষ তারার ফুল ফুটে আছে। তুমি কোন তারা হয়ে জেগে থাকবে রামকৃষ্ণ?

ওই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে করুণ সুরে বেজে ওঠে বাঁশি। সুর ছড়িয়ে যায় আশপাশে। কে বাজায় এমন সুর? বিস্মিত প্রতিবেশী। রাত বাড়ে, কিন্তু বাঁশি থামে না। নীচের ঘরে বসে পড়ায় মন বসাতে পারে না কুমুদিনী। ওর চোখ ছলছল করে। ও হাতের তালুতে চোখ মোছে। ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে ওই বাঁশি থামিয়ে দিতে। কিন্তু মনে হয়, না থাক। প্রীতিলতা ওই বাঁশির ভেতর দিয়ে নিজেকে মুক্ত করুক। কিন্তু বাঁশির সুর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না হোস্টেলের মহিলা সুপার। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছাদে এলেন। কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাতের নিস্তব্ধতা—'প্রীতিলতা!'

ও চমকে উঠে দাঁড়ায়।

'এত রাতে এসব কী হচ্ছে?'

ও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তোমাকে না কতদিন বলেছি, এত রাতে ছাদে বাঁশি বাজাবে না?'

'আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।'

'ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয়। এটা হোস্টেলের নিয়মের পরিপন্থী। যাও, নীচে যাও। এর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ঘটলে আমি অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব। এই শেষবারের মতো বলছি।'

প্রীতিলতা নিঃশব্দে নেমে আসে। এই মুহূর্তে ও কোনো বাকিবতণ্ডায় যেতে চায় না। ওর হৃদয়ে অনেক কান্না। সে অশ্রু তো রোধ করার সাধ্য ওর নেই। ও ঘরে ফিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ভিজে যায় বালিশ। ভোরে একটা মিষ্টি স্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়। দেখে, রামকৃষ্ণ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে ওকে ডাকছে। বলছে, 'প্রীতি বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। চল আমরা বৃষ্টিতে হেঁটে আসি। প্রবল বৃষ্টিতে সাদা হয়ে গেছে প্রান্তর। তবু আমরা হাত ধরে হেঁটে যাব। আমরা কেউই চাই না যে, বৃষ্টি থেমে যাক। তুমি আমার বৃষ্টি প্রীতি। কখনো ঝিরিঝিরি, কখনো পাতার ফাঁকে টুপটাপ নেমে পড়। কখনো গভীর কালো মেঘের ফাঁক থেকে মুষলধারে ঝরে পড়। ধুয়ে যাক আমার সব গ্লানি, ব্যর্থতার যন্ত্রণা। আমি ভুলে যেতে চাই আমার নিষ্ফল সময়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা স্বপ্নের ঘোরে বলে, ‘কৃষ্ণ আমি তোমার সব গ্লানি ধুয়ে দেব। তোমার কোনো ব্যর্থতার যন্ত্রণা থাকবে না। আমি তোমার বৃষ্টি। চল যাই, হেঁটে আসি সবুজ প্রান্তর। চলো যাই, ছুঁয়ে দেখি শস্যকণা, বৃষ্টি যে শস্যকণা সজীব করে।’

রামকৃষ্ণ বলে, ‘তোমার হাতটা আমার হাতে রাখো বৃষ্টি।’

ও হাত বাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় ওর। শূন্য হাত ফিরে আসে বিছানায়। দেখে, জানালা দিয়ে ভোরের আলো ছড়িয়ে আছে ঘরে। সর্বস্ব হারানোর বেদনায় কুঁকড়ে যায় বুক। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে বালিশে। তখন নিজেকে শাসন করে ও, কী ছিচকাঁদুনে মেয়ে হচ্ছিস তুই প্রীতি! এসব কি তোকে মানায়?

নিজেকে সামলাতে পারি না যে, পারি না যে!—অনবরত বালিশে মুখ ঘষতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সেদিনের পর থেকে রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতিদিনই প্রীতিলতার অপেক্ষায় থাকে। অনুভব করে এই অপেক্ষা ওর জীবনে এক প্রচন্ড শক্তি। এতদিন চেতনায় মৃত্যুর ক্ষয় ছিল। এখন নেই। ও এই শক্তি দিয়ে ওর মৃত্যুকে হারিয়ে দিয়েছে। এখন মরণ কী ভাবতেই ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ভাবে, মরণ মানে ভালোবাসার শক্তির মধ্যে প্রবেশ। এতদিন এই মৃত্যুকুঠুরির জীবন ছিল অন্যরকম। ও দেওয়ালের ওপর দিয়ে খোলা আকাশ দেখত—শুয়ে শুয়ে বই পড়ত—খাবারের ডাক এলে বেরোত। এখন মনে হয়, কে বুঝি আসছে—কারো মৃদু হাসিতে মন ভরে যাচ্ছে—আয়ত চোখে উদ্গ্রীব দৃষ্টি দেখলে কেঁপে ওঠে। স্বপ্নে-জাগরণে প্রীতিলতা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বলতে ইচ্ছে করে, প্রীতিলতা তুমি আমার নতুন জীবনের শুরু।

সেদিন বিকেলে প্রীতিলতা সাদা শাড়ি পরে আসে। ওর কালো বরণের ওপর সাদা শাড়ি স্ফটিকের মতো। দৃষ্টি আটকে থাকে না, ছলকে পড়ে। রামকৃষ্ণের মুগ্ধতার মধ্যে অবাক দৃষ্টি। কী সুন্দর লাগছে প্রীতিলতাকে। সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ওর ব্যক্তিত্ব। লাবণ্য এবং শ্রী অনেকের চেহারায় থাকে, তা দৃষ্টি ভোলায়, এক নজরে তাকাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু প্রীতিলতার ব্যক্তিত্বমিশ্রিত সৌন্দর্য চুম্বকের মতো। দৃষ্টি ফেরানো যেন এক অসম্ভব কঠিন কাজ।

রামকৃষ্ণ দেখতে পায়, প্রীতিলতা আজ অনেক বেশি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ। ও বুঝতে পারে যে, প্রীতিলতা বেড়ি ভেঙে ফেলেছে। ওর সামনে কোনো দেওয়াল নেই।

প্রীতিলতা খুব মমতা দিয়ে বলে, 'আজও কি জ্বর আছে?'

'কী জানি, জানি না।'

'দেখি।'

প্রীতিলতার হাত প্রসারিত হয়ে যায়। সে হাত স্পর্শ করে রামকৃষ্ণের কপাল। আলতো করে কপালের চুল সরিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘নাহ, একদম ঠান্ডা। জ্বর নেই।’

‘আমিও জানি, ঠান্ডা।’

‘তবে যে বললেন, জানেন না।’

‘ইচ্ছে করে।’

রামকৃষ্ণ মৃদু হাসে। সে হাসি দেখে রক্তিম হয়ে যায় প্রীতিলতা। হঠাৎ করে কিছু বলতে পারে না। সে হাসির ওপরে রামকৃষ্ণ বলে, ‘প্রীতিলতা এভাবেই কি আমরা শুরু করলাম?’

‘হ্যাঁ, করলাম।’

‘ভয় করছে না?’

‘একটুও না।’

‘আজ ভোররাতে আমি একটা ভারি মিষ্টি স্বপ্ন দেখেছি।’

‘কী?’

‘দেখেছি, তুমি আর আমি রেললাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছি।’

প্রীতির গাঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ—‘তুমি আর আমি!’

‘হ্যাঁ, তুমি আর আমি। তোমার গায়ে আমার লাল র□্যাপার। তুমি বলছ, এখন থেকে এই র□্যাপারটি আমার। আমি কী উত্তর দিয়েছি জানো?’

‘কী?’

‘আমি বলেছি, তুমি আমার সব নাও। আমার মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং ব্যর্থতার গ্লানিও।’

প্রীতিলতার কণ্ঠে আবেগ ঘনীভূত হয়ে যায়। বলে, ভোররাতে আমিও স্বপ্ন দেখেছি।

রামকৃষ্ণের চোখের তারায় নিবিড় ছায়া, ‘কী?’

‘তুমি বলছ, প্রীতি, তুমি আমার বৃষ্টি। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। চলো আমরা বৃষ্টির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাই। তুমি আরো বলেছ, বৃষ্টি, তুমি আমার ব্যর্থতার গ্লানি ধুয়ে দাও।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আহ্ কী অপূর্ব স্বপ্ন আমাদের।’

‘কৃষ্ণ, আমি তোমার ব্যর্থতার গ্লানি ধুয়ে দেব।’

রামকৃষ্ণ ওর হাত চেপে ধরে—‘আমি জানি তুমি তা পারবে। তুমি আমার ব্যর্থতাটুকু পূরণ করে দিও প্রীতিলতা। প্রতিশোধ চাই। রক্ত চাই। যে রক্ত আমরা দিচ্ছি সে রক্তের বিনিময় চাই।’

‘আমি সবই করব। তুমি তোমার অভিজ্ঞতাটুকু আমাকে দাও। সময় বড়ো কম।’

রামকৃষ্ণ বলতে শুরু করে, ‘এভাবেই চলছিল। প্রায় চব্বিশ দিন পর এক গভীর রাতে সেলের দরজা খুলে গেল। তখন ডিসেম্বরের শেষ। জেলার, ডেপুটি জেলার, জমাদার সবাই এসে হাজির। ঘুম-জড়ানো চোখে হকচকিয়ে গেলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমাদের নিয়ে আসা হল জেলগেটে। বিশজন সশস্ত্র পুলিশ ও একজন গুর্খা হাবিলদার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দুজনকে হাতকড়া পরিয়ে গেটের বাইরে আনা হল। আমাদেরকে মাঝখানে রেখে সামনে-পেছনে গার্ডের পাহারায় স্টেশনে নিয়ে এল। তারপর ট্রেনে উঠলাম। ভেবেছিলাম, আমাদের চট্টগ্রাম নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভুল ভাঙল চাঁদপুর স্টেশন দেখে। এই আমার কর্মক্ষেত্র এবং শেষ কর্মক্ষেত্র। ভুলের মাশুল দিতে যাচ্ছি কোথায়, কে জানে! আমাদের স্টিমারে ওঠানো হল। বুঝলাম গোয়ালন্দ যাচ্ছি। চারদিকে কর্ডন দেওয়া একটা জায়গায় বসে আছি। অন্যরা চারপাশে ঘিরে রয়েছে আমাদের। সামনে রাইফেল হাতে একজন গার্ড বসে তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছে। ভোরবেলা পদ্মা দেখে সৃষ্টির অপার রহস্য আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। তরঙ্গসংকুল পদ্মার জলরাশি। সূর্যের আলোয় সে তরঙ্গের ওপর ঝলকাচ্ছিল রুপালি ঝিলিক। রুপালি কণা জলের বুকে ভাঙে আর গড়িয়ে যায়। মানুষের কী সাধ্য যে এই দৃশ্য তৈরি করে। পদ্মার আর এক নাম কীর্তিনাশা। শুনেছি কেবল এই নদীর দুকূলপ্লাবী ভাঙনের গল্প। এই নদী-গহ্বরে মুহূর্তে বিলীন হয়েছে কত জনপদ, গ্রাম, মানুষের জীবন। অন্যদিকে পলি ফেলে উর্বরা করছে নতুন মাটি। শস্যে ভরে উঠছে সে মাটি। পদ্মার এই ধ্বংস এবং সৃষ্টির মধ্যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপরে আমাদের বিজয়-কেতন ওড়াতে চাই। এইসব ভাবছি, এমন সময় গার্ডের ধমক শুনে নিজের চিন্তা ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের চারপাশে উৎসুক যাত্রীদের ভিড়। তাদের সরে যাওয়ার জন্য ধমকাচ্ছে গার্ড। ওদের কয়েকজনই একটা প্রশ্ন করল, ওরা কী করেছে? গার্ডের চিৎকার, ভাগো হিঁয়াসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওদের জানতে দেয় না যে আমরা কী করেছি। আমরা চাই যে, ওরা জানুক আমরা কী করেছি। এইসব নিরীহ, গোবেচারা মানুষগুলো বুঝুক যে, আমরা ওদের জন্যই লড়ছি। ওরা শুধু নিরীহ দৃষ্টিতে অবাক হয়ে থাকবে কেন? ওরা জেনে নিক আমাদেরকে, গভীর করে বুঝুক আমাদেরকে। বলুক, আমরাও আছি তোমাদের সঙ্গে। তোমরা ভয় পেয়ো না।

কিন্তু ওদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া আর কিছু ঘটে না।

'বেলা তিনটায় গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। শিয়ালদাগামী ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে, কলকাতা যাচ্ছি। ফরিদপুর পেরিয়ে ট্রেন ছুটল কুষ্টিয়ার দিকে। পেরিয়ে যাচ্ছি স্টেশন। উত্তরবঙ্গে আমি আগে কখনো আসিনি। ধু ধু রুক্ষ এ এলাকা। তাল-খেজুর আর ফণীমনসার ঝোপে ভরা। এই প্রকৃতির মতো মানুষগুলোও নিরন্ন। কাপড় আছে কি নেই, হাত পাতছে পয়সার জন্য। স্টেশনে কত বিচিত্র ধরনের মানুষ। গৃহহীন, ক্ষুধার্ত, ভিখিরি ও অসহায়। নিজেরা কিছু করতে পারে না বলে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশী। স্বাধীনতা পেলে এসব মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করে দেওয়া যেত। ট্রেনের ঝিকমিক শব্দের সঙ্গে ওদের বুকের ধুকপুক ধ্বনির কোনো পার্থক্য নেই।

'আমরা এসব ভাবনার মধ্য দিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে এলাম। আগে কখনো কলকাতা আসিনি। ফলে কলকাতা দেখার চমক আমার মনে ছিল। কৌতূহল নিয়ে চারদিকে তাকালাম। কিন্তু মন ভরে দেখার সুযোগ ছিল না। কারণ আমাদের জন্য প্রিজন ভ্যান তৈরিই ছিল। অল্পক্ষণের ভেতরই ভ্যানে উঠতে হল। ভ্যান ছুটল আলিপুর জেলের দিকে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! প্রিজন ভ্যানের ভেতরে বসে কলকাতা শহরের কিছুই আমার দেখা হল না। কারাগারের ভেতরে ঢুকতেই আবার চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল এ শহর। আমাদের আসার খবর পেয়ে আইরিশ জেলার ছুটে এল। সে আমাদের নিয়ে গেল তেরো নম্বর ওয়ার্ডে। ওখানে ছিল অস্ত্র আইনে ধরা পড়া আরো তিনজন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দি। পরদিন সকালে ওদের সঙ্গে সময়টা ভালোই কাটল। পাঁচজনে মিলে বেশ আড্ডা জমল। ভাবলাম, এখানে ভালোই কাটবে। কালীপদকে বললাম, মনে হচ্ছে শেষ কটা দিন সুখেই কাটবে। কালীপদ মৃদু হেসে বলল, বেশি আশা কোরো না বন্ধু। ওর কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। যাহোক, বেলা আটটার মধ্যে টের পেলাম যে, সত্যি বিধি বাম। আমাদের দুজনকে চোদ্দো নম্বর সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওই সেলে দীনেশ গুপ্ত একা ছিল। সিমসনকে হত্যার সময় দীনেশ গুপ্ত গলায় গুলি চালিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে যায়। ব্রিটিশ সরকার ওকে সারিয়ে তুলেছে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে বলে। ওর গলায় ক্ষতের দাগটা তখনও শুকোয়নি। এখানে ছিল সারিবদ্ধ চোদ্দোটি সেল। তার সামনে অ্যান্টিসেল। ওখানেই আমাদের স্নান এবং আহারের ব্যবস্থা ছিল। ওই অ্যান্টিসেলের সামনে দিয়ে হাত-তিনেক চওড়া লম্বা বারান্দা সোজা চলে গেছে। তার চারপাশ উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। একমাত্র জমাদারের হাঁকডাক ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই না। সার্জেন্ট ও জেল সেপাইরা চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেয়। তবে কুমিল্লার জেলের মতো সবসময় সেলে থাকতে হয় না। প্রত্যেক দিন দুপুরে এক ঘন্টা এবং সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সেলে থাকতে হয়। বাকি সময় ওয়ার্ড এলাকায় ঘোরাফেরা করা যায়। ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম বলে আমি সকালে উঠতে পারি না। কালীপদ আর দীনেশ ওই লম্বা বারান্দায় পায়চারি করত।

'আঠাশে ডিসেম্বর আমাদের মামলা শুরু করার দিন ধার্য হয়েছে। কালীপদ বলল, "রামকৃষ্ণ, আমাদের কি কিছু করণীয় নেই?" বললাম, "আছে। আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে।" কালীপদ বলল, "লাভ কী? মামলার রায় কী হবে, তা তো আমাদের জানা আছে।"

"কালীপদ, আমিও জানি ফলাফল কিছু হয়তো হবে না। তবু লোকজনের কাছে এর প্রচারের গুরুত্ব আছে। মানুষ এইসব ঘটনা যত বেশি জানবে তত তারা সচেতন হবে।"

'কালীপদ দ্বিধা করে বলল, "কলকাতা আমাদের অচেনা জায়গা। এখানে আমরা কার সাহায্য পাব?"

'বললাম, "আমার পরিচিত উকিল আছে বিনোদবাবু। তাঁকে চিঠি পাঠাব। তিনি যেন মামলার দিন কোর্টে হাজির থাকেন অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।"

'নির্দিষ্ট তারিখে গার্ড পরিবেষ্টিত ভ্যানে করে আমাদের আলিপুর কোর্টে হাজির করা হয়। পুলিশ ও সার্জেন্ট দিয়ে ভরা কোর্ট প্রাঙ্গণ। লোহার জাল দিয়ে ঘেরা ডকের মধ্যে আমাদের ঢোকানো হয়। আমাদের সামনে হাত পনেরো দূরে একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার সাজানো রয়েছে। বিশেষ আদালতে আমাদের বিচার হবে। তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত সে আদালত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রেসিডেন্ট মি গার্লিক। আর একজন বিচারক হিন্দু, অন্যজন মুসলমান। যে উকিলকে চিঠি লিখেছিলাম, দেখলাম তিনি এসেছেন, সঙ্গে আরো দুজন ব্যারিস্টারও এসেছেন। একজন মেঘনাদ মিত্র, অন্যজন বি সি চৌধুরী। দুজন আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন। জানতে পারলাম, দেশগৌরব সুভাষ বসু, এঁদের দুজনকে আমাদের পক্ষে নিযুক্ত করেছেন। অপ্রত্যাশিত আনন্দে মন ভরে গেল। মনে হল এ জন্ম সার্থক। বিচারের রায় যাই হোক, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তো আমাদের পাশে আছেন। একটু পরে কালো গাউন পরে বিচারকরা তাঁদের আসনে বসলেন। তারপর পাবলিক প্রসিকিউটর নগেন ব্যানার্জি শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য। বক্তব্য নয়তো, যেন যাত্রার পালায় নেমেছেন। কণ্ঠস্বর ওঠানামা করিয়ে নানা ভঙ্গিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আন্দোলিত করে ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা দিলেন। যেন তিনি ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী, অলৌকিকভাবে ঘটনাস্থলে ছিলেন। এই ঘটনা দেখে তিনি ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ম্রিয়মান। তিনি পরিষ্কারভাবে এই নারকীয় হত্যাকান্ডের আসামিদের শাস্তি দাবি করলেন। স্পষ্ট বললেন, এদের ক্ষমা নেই। মামলার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বক্তৃতার মাঝখানে তারিণীর রক্তাক্ত পোশাক বিচারকদের সামনে হাজির করা হয়। দেখলাম, রক্তরঞ্জিত জামা ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। 'জামাটি দেখে বিচারকমন্ডলি আমাদের দিকে তাকালেন। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। মনে মনে বললাম, আমাদের কোনো অনুতাপ নেই। বরং বাঙালি নগেন ব্যানার্জির আচরণে ঘৃণা এবং লজ্জা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, হাতে একটা রিভলবার থাকলে নগেন ব্যানার্জির শরীরটা ওই জামাটার মতো ফুটো ফুটো করে দিতে পারতাম।

'মামলা প্রতিদিনই চলতে থাকে। শুনানি আর সওয়াল জবাব। একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। ইচ্ছে হয় না ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে। ইচ্ছে হয় না দিনের পর দিন কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে। একদিন সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রাজবন্দিরা দুই নম্বর ওয়ার্ডে উৎসব করছিল। দুই নম্বর ওয়ার্ড ছিল স্পেশাল ওয়ার্ড। সেদিন বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় আইরিশ জেলার এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল সেই ওয়ার্ডে। আমাদের পেয়ে তিরিশ-চল্লিশজন রাজবন্দি ঘিরে ধরে। সবার সঙ্গে কথা বলে সেদিন খুব ভালো লাগছিল। বেশ কিছু খাওয়া-দাওয়া হল। সুভাষ বসু এসেছিলেন। বললেন, হাইকোর্ট করবেন না কি? কালীপদ বলল, প্রয়োজন হলে করানো উচিত। তিনি হাসলেন। এ বিষয়ে আর খুব বেশি কথা হয়নি। আমার মন খচখচ করছিল। তাঁর হাসি দেখে বুঝতে পারছিলাম যে, ফাঁসি থেকে আমাদের রেহাই নেই। তিনি আমাদের সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পথেই অনুপ্রাণিত করছেন যেন। তাঁর দরদমাখা কথায় মন জুড়িয়ে যায়। ব্যবহারও ছিল বন্ধুসুলভ, যেন আমরা তাঁর কতকালের চেনা। পরে জেনেছিলাম যে, পুজোর অজুহাত দেখিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ তিনি নিজেই করে নিয়েছিলেন। হয়তো আমাদেরকে শেষ বিদায় জানাতে এসেছিলেন, কে জানে।

'যা হোক, মামলার হাজিরা দিতে নিয়মিত কোর্টে যাতায়াত করতে হয়। একদিন টেলিগ্রাম এল যে, বাবা মারা গেছেন।'

'বাবা মারা গেছেন!'

প্রীতিলতা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

'আমি তেমন দুঃখ পাইনি। আমার মনে হয়েছিল, জেলে বসেই আমি এমন একটা খবর পাব। আমি ধরা পড়ার পর পুলিশ বাবাকে খুব নির্যাতন করেছে। সেই থেকে বাবা অসুস্থ ছিলেন।'

'তবু তো বাবার মৃত্যু!'

'প্রীতি, বিপ্লবীদের বাবার মৃত্যু পাথরের মতো সইতে হয়। উপরন্তু এমন একটা সময়, যখন তার বিচারের প্রহসন চলে। তখন অবিচল না থেকে উপায় কী বল?'

'তোমার ধৈর্য এবং সাহসে আমি মুগ্ধ।'

'শুধু ধৈর্য এবং সাহসে? প্রেমে নয়?'

'দুষ্টুমি কোরো না।'

'যাক, শোনো। কোর্টে তো অনেকের সাক্ষী নেওয়া হল। একদিন ক্রেইগ এল সাক্ষী দিতে। খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, ক্রেইগই কালীপদকে শনাক্ত করে বলল, সে কালীপদকে গুলি করতে দেখেছে। কালীপদ তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। মিথ্যারও তো একটা সীমা থাকে! ও তো কেবিনের ভেতর লুকিয়ে ছিল। আমাদের কীভাবে দেখবে? ক্রেইগের সাক্ষীর পর ব্যারিস্টার বি সি চৌধুরী আমাদের ডকে এসে দুঃখে ফেটে পড়লেন। বললেন, ক্রেইগের সাক্ষীর পর তো আর ভরসা করতে পারছিনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘কালীপদ খুব ঠান্ডা মাথায় বলল, “এ মামলার পরিণতি তো আপনাদের জানাই আছে। আপনার কর্তব্য আপনি সাধ্যমতো করেছেন। সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আর চিন্তা করবেন না। ক্রেইগ মিথ্যা বলে সনাক্ত না করলেও সাক্ষ্য-প্রমাণের জঞ্জাল ঠেলে এগুনো মোটেই সম্ভব নয়।”

‘সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে আমি আর কালীপদ চুপচাপ বসে ছিলাম। বিচারের এই প্রহসন আমার অসহ্য লাগছিল। কালীপদকে বললাম, “সারা জীবন জেল-বন্দি থেকে লাভ কী? এই অভিশপ্ত জীবনের বোঝা আমার সইবে না। আমার মনে হয় ফাঁসিই আমার জন্য ভালো।”

‘বুঝতে পারলাম কালীপদ বেদনাহত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চেহারা বিবর্ণ, সাদা হয়ে গেল। আমি তখন আরো জোর দিয়ে বললাম, যাবজ্জীবন দীপান্তরে পচে মরার চেয়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে মৃত্যুবরণ হাজার গুণে শ্রেয়। এ আত্মদান তরুণের মনে প্রেরণা জোগাবে। দেশমাতার মুক্তির সংগ্রামে তারা অকাতরে ঢেলে দেবে বুকের তাজা রক্ত।

‘কালীপদ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “থাক এসব কথা।”

যাহোক, আমাদের বিচারের সব পাঁয়তারাই প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। শুনানি, সওয়াল-জবাব শেষ হয়েছে। কুমিল্লা জেলে সম্পন্ন হয়েছে আমাদের সনাক্তকরণের কাজ। চাঁদপুর স্টেশনের প্লাটফরম থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে কার্তুজের খোল, রিভলবারের চেম্বারের ভেতর ধোঁয়ার চিহ্ন, কোন রিভলবার থেকে কোন কার্তুজ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে অস্ত্র-বিশেষজ্ঞদের মতামত, সবই আছে। এরপর বাকি রইল আমাদের জবানবন্দি।

‘কালীপদের ইচ্ছা ছিল ভগৎ সিংহের মতো একটি বলিষ্ঠ জবানবন্দি দেবে। কিন্তু ব্যারিস্টাররা নিষেধ করলেন। প্রথমেই জবানবন্দির জন্য আমাকে বিচারকদের সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনা হল। আমি কী বলব? আমার কিছু বলার ছিল না। দু-চারটা মামুলি কথা বলে বক্তব্য শেষ করলাম। আমাকে বয়স জিজ্ঞেস করল, বললাম বিশ বছর। ওদের বিশ্বাস হল না। আসলে বয়সের তুলনায় আমাকে বড়োসড়ো দেখায়। ফুটবল খেলতাম তো। যাহোক শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের সন-তারিখ জানানো হলে ওরা বিশ্বাস করল। ১৯২৮ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আমি চট্টগ্রাম-বিভাগীয় বৃত্তি পেয়েছিলাম, বলায় ওদের বিশ্বাস আরো পোক্ত হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘এরপর কালীপদের পালা। কালীপদও আমাকে অনুসরণ করেই ওর বক্তব্য বলল। কালীপদ ওর বয়স বলল, সতেরো। বিচারকরা কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল। সতেরো বছর বয়স নিয়ে ওরা চিন্তায় পড়েছে। কারণ, কালীপদের চেহারা কিশোরের মতো কচি। আমার মতো গোঁফ-দাড়ি ওর নেই। শেষে বিচারকরা কালীপদের বয়স সতেরো মেনে নিল এবং বয়স পরীক্ষার হাত থেকে ওকে নিষ্কৃতি দিল।

‘সেদিনের মতো ফিরে এলাম কোর্ট থেকে। কিছুই ভালো লাগছিল না। খুব একটা মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম। মৃত্যুকুঠুরির নিঃসঙ্গ অন্ধকার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ইচ্ছে হয় বুক উজাড় করে কাঁদি, কিন্তু কান্না আসে না। সেলের সামনে বারান্দাটা যদি বিশাল মাঠ হয়ে যেত তাহলে ফুটবল নিয়ে ছুটতে পারতাম। যদি ক্রেইগের মাথাটাকে ফুটবল বানাতে পারতাম! আহ্ কী শান্তি!

‘এল রায় বেরুবার দিন। সেদিন ছিল শনিবার, জানুয়ারি চব্বিশ তারিখ। আমাদের দুজনকে কোর্টে নিয়ে আসা হল। চারপাশে সশস্ত্র পাহারা। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ডকের ভেতর ঢোকানো হল। বিশেষ আদালতের সভাপতি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং প্রমাণাদির দীর্ঘ বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিলেন। দু-কান ভরে শুনলাম অভিযোগ এবং তার বিবরণ। প্রচুর মিথ্যা তথ্য এবং মিথ্যা সাক্ষীর বিবরণ আছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। শোনাটাই নিয়তি, কোনো প্রতিবাদ নয়। এরপর ঘোষণা করা হল রায়। আমাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল। মৃত্যুদন্ডের পদ্ধতি হল ফাঁসি।’

প্রীতিলতা অস্ফুট শব্দ করে মুখে হাতচাপা দেয়। রামকৃষ্ণ হাসে—‘তুমি একটা পাগল দেখছি। এ তো জানা ঘটনা। আমি তো খুব সহজে বলে যাচ্ছি।’

প্রীতিলতার চোখে জল টলটল করে।

‘প্রীতি,তুমি না বলেছিলে আমাদের সময় কম। প্রীতি মুখ তোল। আমার দিকে তাকাও।’

প্রীতিলতা শাড়ির আঁচলে মুখ মোছে।

‘কালীপদর রায় শুনবে না?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতি মাথা কাত করে।

‘ওর রায় ঘোষণার সময় বলল, আদালতের মত হল বিধিগতভাবে ওকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া। কিন্তু আঠারো বছরের নীচে ফাঁসি দেওয়া আইন-বহির্ভূত। তাই কালীপদকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়।’

‘সেই মুহূর্তে অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে যায়। আমি ওকে জড়িয়ে ধরি। বললাম, দুজনের মধ্যে একজন যে বেঁচে গেলাম, এ-ই তো বিরাট লাভ। তুমি কোনোমতে রক্ষা পাও, এ আমি মনে মনে চাইছিলাম। আমি কী যে খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

দেখলাম কালীপদ পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে।

‘তখন আমাদের ব্যারিস্টার দুজন আমাদের কাছে এলেন। বললেন, হাইকোর্টে আপিল করতে হবে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি করি। বলি, আমার জন্য হাইকোর্টে আপিল করবেন না। তাহলে সব ভন্ডুল হয়ে যাবে। তবু তো একজন বেঁচে গেছি। এটাই আমাদের বড়ো পাওনা।

‘ওঁরা বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মৃদু হেসে মাথা নাড়লাম। ওঁরা বললেন, ব্যাপারটা আমাদের ভাবতে দিন। আমরা দেখব।

অন্যদিনের মতো প্রহরী বেষ্টিত প্রিজন ভ্যানে ফিরে এলাম জেলে।

‘কিন্তু আজ একদম অন্যরকম লাগছে। বোঝাতে পারব না কেমন। দুঃখ, আনন্দ, বেদনার অতীত এক মানুষ আমি। আমার স্বপ্ন ছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। আমি আমার শেষ কর্তব্যটুকু তো করেছি। নিজের জীবন আমার কাছে তুচ্ছ। কালীপদ তো রয়ে গেল। ও হয়তো এ দেশের স্বাধীনতা দেখে যাবে। হয়তো আরো কোনো বড়ো কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে। এই দিন কালীপদের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কারণ আমাকে অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। কালীপদ কেঁদে ফেলল। বলল, “ভাই, তুমি মহান। তোমাকে ভুলতে পারি না, ভুলব না।” এই দেখ, প্রীতি তোমার চোখে আবার জল! তুমি যদি এমন কর তাহলে তোমাকে আর আমার কথা বলব না। এই আমি চুপ করলাম।’

প্রীতিলতা ফিক করে হেসে দেয়—‘ঠিক আছে চুপ করতে হবে না।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আর এমন করবে না তো? তোমার চোখে কি জল মানায় প্রীতি?’

‘আমিও তো মানুষ।’

ওর এই ছোট্ট কথায় স্তব্ধ হয়ে যায় রামকৃষ্ণ। বড়ো তীক্ষ্ণ হয়ে ওর বুকে বেঁধে। প্রীতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে ও ছিল বিপ্লবী। জীবনকে একভাবে দেখত, এখন জীবনকে অন্যভাবে দেখছে। দেখা উচিত। এখন ওর জীবনে আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ওর বুকের ভেতর ‘মানুষ’ শব্দটা বড়ো বেশি উথাল-পাতাল করে।

প্রীতিলতার চোখে চোখ রেখে স্নিগ্ধ হেসে বলে, ‘হ্যাঁ প্রীতি, আমরাও মানুষ।’

তখন সেপাই এসে কাছে দাঁড়ায়—‘আপনাদের সময় হয়ে গেছে।’

প্রীতিলতা দু-চোখ তুলে রামকৃষ্ণের দিকে তাকায়—‘সময় যে হয়ে যায় আমরা তো টের পাই না।’

রামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বলে, ‘মৃত্যুকুঠুরিতে বাসকারী মানুষের সময় এমনই হয়ে যায় প্রীতি। আমরা তো সময়ের অপর পারে বসবাস করছি। আমাদের সময় অনন্ত।’

প্রীতিলতার বুক গুমরে ওঠে। বুঝতে পারে না কোন শক্তিতে রামকৃষ্ণ এমন অবলীলায় কথা বলে। ওর কোথাও মচকায়নি, জং ধরেনি, ভাঙেনি। এখনো ও টগবগে তরুণ—ওর জওয়ানকিতে শত সমুদ্রের গর্জন। সেই প্রবল স্রোতে ভেসে যায় প্রীতিলতার মতো হাজার মানুষ। রামকৃষ্ণ বুক টান করে তটরেখায় দাঁড়িয়েই থাকে। ওর কোনো সময় নেই। মহাকালের অনন্ত সময় ওর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা ঠিক করে আজ ও একটি কবিতা লিখবে। আজ বাঁশি নয়। বিচিত্রভাবে নিজেকে কেবল প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে। মাল-মশলা থাকলে ও হয়তো এখন একটি বোমা বানাত। ওর কাছে বোমা এবং কবিতায় কোনো তফাত নেই। দুটোই ওর কাছে সমান প্রয়োজনীয়। ডায়রির সাদা পৃষ্ঠায় আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে ফুটে ওঠে কতগুলো পংক্তি—হয়তো এখন তোমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি স্বপ্নের মধ্যে চলে যাচ্ছ। কোনো এক সবুজ প্রান্তরে চলে গেছ। যেখানে কোটি কোটি তারকার সাদা দ্যুতি তোমার ওপর ঝরে পড়ছে। আর তুমি আমার ভালোবাসার দেবদূত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছো।

মোম জ্বালিয়ে টেবিলে লিখছে প্রীতিলতা। কখনো মোমের নীল শিখার দিকে তাকিয়ে থাকলে থেমে যায় ওর কলম। ভেসে ওঠে রামকৃষ্ণের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন মোমের শিখার মতো নীল এবং কম্পনরত, অনবরত কথার মোম ঝরে পড়ে সে শিখার গোড়া বেয়ে। প্রীতিলতার সাধ্য কি যে, রামকৃষ্ণ- থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। ও লেখে—আমার এখানে সময় অফুরন্ত। সময়কে যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করা যায়, যেন একতাল ননি, খুশিমতো ভাঙাগড়া আর কি! কখনো এই সময়ের চাপে আমি বিধ্বস্ত হয়ে যাই এবং তোমার কাছ থেকে আমার এই অবস্থান অর্থাৎ স্থানের এই দূরত্ব আমাকে প্রবলভাবে গ্রাস করে। ইচ্ছে করে ছুটে যাই তেমন একটি বাড়িতে, যেখানে একটি কারুকাজ করা দরজা আমার জন্য খোলা আছে। আমি পেরুতে থাকি বারান্দা-বারান্দা-বারান্দা।

নিজের লেখা পংক্তিগুলোর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে প্রীতিলতা। ও কেমন করে এসব লিখছে? রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কখনো তো জানতে পারেনি যে, হৃদয়ের ভেতর এত কথা জমে আছে? এত আবেগ এত ভালোবাসা? আহ্ এই কি আমি? যে আমি জীবনের সোজা পথ ছেড়ে কাঁকর-বিছানো পথে নেমে এসেছি? যে আমার সামনে মৃত্যু একটি সামান্য ঘটনা? যে আমার সামনে দেশের স্বাধীনতা একটি বিশাল কাঁসার ঘণ্টা হয়ে ঝুলে আছে? আমি দৌড়চ্ছি সেই ঘণ্টায় ঢং করে একটা বাড়ি দেওয়ার জন্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এই আমি কেন রামকৃষ্ণকে নিয়ে এত ভাবছি? কেন বুকের ভেতর গুমরে গুমরে ওঠে? কেন কেঁদে সুখ? চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে আনন্দ? ভোররাতের মিষ্টি স্বপ্ন আমার চেতনার ক্যানভাসে উজ্জ্বল রং। আমি তো প্রীতিলতার বাইরে অন্য কেউ। কে আমাকে এমন পালটে দিল? বয়ঃসন্ধিক্ষণের সেই মন? আসলেই তাই। এই মন নামক যে একটা বিশাল অদৃশ্য বস্তু আছে, যা প্রতিমুহূর্তে সুখ-দুঃখের জন্ম দেয়, তাকে নিয়ে এখন আমার ভীষণ কষ্ট। দিনের বেলা তবু কাটে, কিন্তু দিন ফুরোলে সে যন্ত্রণা গভীর হয়ে চেপে বসে। আমি ঘুমোতে পারি না, অনেক রাতে বারান্দায় বসে পূর্ণিমার গোল চাঁদ দেখি। চাঁদটা যেন বিশাল হয়ে আমার কাছাকাছি নেমে আসে। আমি ওই চাঁদকে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ মনে করি। ভুলে যাই বিশ্ব-সংসারে আরও কিছু জিনিস আছে। চাঁদ দেখলে তুমি আমার কাছে এত তীব্র হয়ে ওঠো কেন, তা আমি বুঝি না। কখনো, সময় এবং তার পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলো এমন। যুক্তির বাইরে চলে যায়। এই যুক্তিহীন আবেগটুকুই মন ভরিয়ে দেয়। এটুকুই প্রচণ্ড ভালোবাসা। সে ভালোবাসায় স্নাত হলে আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মুছে যায়—জেগে থাকে একটিমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র, সমস্ত মহাকাশে যার দীপ্তি বহমান, সে তুমি, সে তোমার গভীরতর ভালোবাসা।

আসলে দুঃখ ভোলার জন্যই তো এইসব লেখা। খ্যাতির জন্য নয়, অমরত্বের জন্য তো নয়ই। তাহলে কি লেখায় ভুলে থাকা যায়? জানি, তাকে মেনে নিতেই হবে। তবু দুঃখই। দুঃখ একবারেরই। কেননা জীবনও একবারের। যখন দুঃখ আর জীবন এক হয়ে যায়, তখন একটি পথ খোলা থাকে। ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকি। কোথায় তার শুরু, কোথায় তার শেষ? সেখানে কি বৃষ্টি পড়ে? অবিশ্রাম, অবিশ্রান্ত? আমি জানি না। জানতে বড়ো ইচ্ছা হয়। ইচ্ছে হয় পথটি বেছে নেবার।

শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রীতিলতার টেবিলের মোম। কিন্তু ওর লেখা শেষ হয় না। ডায়রির পৃষ্ঠাগুলো ভরে যায় গোটা-গোটা অক্ষরে, যেন অক্ষরগুলো এক একটি দ্বীপের মতো। এখন ওর মনে হয় শুধু লিখি, যা কিছু মনে আসে তা লিখি। সবকিছু একটা অবয়ব নিয়ে রামকৃষ্ণ হয়ে যাক। দুঃখ ভোলায়, সৃষ্টির নতুন ঐশ্বর্যে ভরে দেয় তোমাকে, জন্ম একদিনের নয়, জন্ম প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের। যে জন্ম তোমার নিঃসঙ্গতা কাটায়, সে জন্ম তোমার এখন। সোনালি সময় পেরিয়ে এসেছ? না, সোনালি সময় সামনে। এই তো তোমার কাঙ্ক্ষিত যৌবন, যৌবন নতুন করে যুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নামার। ক-বার ভুল দ্বীপে যায় মানুষ? একবার? দু-বার? তারপর মানুষ ঠিক দ্বীপে পৌঁছে যায়, যে দ্বীপ মানুষের জন্য সবুজ হয়ে ওঠে, মানুষই যে দ্বীপকে সবুজ করে তোলে। দ্বীপ আর মানুষ মিলে নতুন ফুল ফোটায়। দ্বীপকে সবুজ করে দাও—বৃষ্টি নামুক, বৃষ্টি।

মোম নিভে যায়। প্রীতিলতা দরজা খুলে বাইরে আসে। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস চোখ মুখ স্পর্শ করে। ওর মনে হয় বাতাসে জলের কণা আছে, তাও ঠান্ডা। বৃষ্টি হতে পারে। ও বারান্দার ধারে বসে নীচে পা ঝুলিয়ে দেয়। কুচি কুচি চুল উড়ে এসে মুখে পড়ে। ও ভাবে হয়তো বৃষ্টি হতে পারে, হয়তো না। কিন্তু আমার বুকের ভেতর তো শ্রাবণের ধারা বইছে। বড়ো অশান্ত হয়ে আছি। বড়ো অস্থির। যা কিছু প্রিয়, সবচেয়ে প্রিয়, তাই তো এ দেশের মতো রামকৃষ্ণের অবয়ব। যা কিছু সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আপন, যা আমার, তবু যা চাই। আরও চাই। দিন যে ফুরিয়ে আসছে। সামনে রাত, শুধু রাত। যা শুরু হতে জানে, শেষ হতে জানে না। এমন তো হবেই, যখন আর ওকে দেখতেও পাব না। ভোর দেখব না, সন্ধ্যা দেখব না, গান শুনব না, তাহলে কী হবে? রামকৃষ্ণের এই অবয়ব তো চিরদিনের। ওকে ছাড়া কবিতা নেই, কখনো থাকবে না। আজ আমি একটিও কবিতা লিখতে পারলাম না। তাহলে কি আজ বাঁশি বাজাব? না, আজ আর কিছুই হবে না, কিছুই না। তখন জোর বাতাসের ঝাপটায় বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ে। প্রীতিলতা ঘরে আসে। মধ্যযাম পেরিয়ে গেলে ও ঘুমোনোর চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১০

পরদিন পিসিমার বাড়িতে দলের আরও কয়েকজনের সঙ্গে গান-কটন বানানোর জন্য জেদ করতে থাকে। প্রীতির এক কথা—'মাস্টারদা গান-কটন তৈরি করে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমিও গান-কটন তৈরি করব।'

পিসিমা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে—'বোমা তৈরির একটি জরুরি অংশ গান-কটন। তুই এটা তৈরি করতে পারবি না প্রীতি।'

অমলেশ বলে, 'এর জন্য বিজ্ঞান পড়া ছাত্রছাত্রীদের দরকার।'

প্রীতিলতার জেদ কমে না। বলে, 'কল্পনা পারলে আমিও পারব।'

'কিন্তু কল্পনা তো বিজ্ঞানের ছাত্রী।'

পিসিমা ওকে শাসন করে—'পাগলামি করে না প্রীতি। মনে নেই বোমা বানাতে গিয়ে'—

'তুমি আমাকে সেই ঘটনার কথা বলেছিলে পিসিমা।'

'বল দেখি কী বলেছিলাম? তোর মুখেই আবার শুনি।'

'বলেছিলে বোমা বানাতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, তারকেশ্বর দস্তিদার ও অর্ধেন্দু দস্তিদার আহত হয়েছিল। আরো বলেছিলে যে, বিপ্লবী রামকৃষ্ণর কথা পুলিশ জানত। ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল পুলিশ। তিনজন পুড়ে যাওয়ার পরে বোমা বানানোর কাজে নতুনদের দায়িত্ব না দেওয়ার কথা ভাবেন মাস্টারদাসহ অন্যরা। এরপর অনন্তদা আর গণেশদা সতেরোটি বোমা বানান। কোনোটি পাঁচ সেকেন্ডে, কোনোটি সাত সেকেন্ডে ফাটবে।'

এইটুকু বলে পিসিমার দিকে তাকায় প্রীতিলতা। বলে, 'পেরেছি ঠিকঠাক বলতে?'

'পেরেছিস। তবে নতুনদের এই কাজ করতে না দেওয়ার জন্য—'

'জানি। আমি সব জানি। এসব কথা শুনিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ো না। আমাকে শেখালে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

খুব সাবধানতার সঙ্গে শিখব। আমাকে দিয়ে কোনো দুর্ঘটনা হবে না।'

অমলেশ শেষে আপোস করে, 'ঠিক আছে প্রীতি এই দলে থাকুক। তবে তার আগে গান-কটন বানানোর জন্য যে রাসায়নিক কিনতে হবে, তার জন্য অর্থ দরকার। আগে আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।'

প্রীতিলতা বলে, 'অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব আমি নিলাম।'

'ঠিক আছে।' পিসিমা হাসলেন—'তোর জন্য আরও একটা খবর আছে প্রীতি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদানের জন্য তোর আবেদনের কথা মাস্টারদাকে জানানো হয়েছিল। মাস্টারদা বলেছেন, এখনো সময় আসেনি। সময় এলে তিনি খবর দেবেন।'

প্রীতিলতার মুখ ম্লান হয়ে যায়। ঠিক আছে সময়ের অপেক্ষাতেই থাকবে ও। কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করবে সে কথা ভাবতে থাকে। ওর বাবা গরিব কেরানি। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির হেড ক্লার্ক। ও মাসে কুড়ি টাকা বৃত্তি পায়। বাবার কাছ থেকে মানি-অর্ডার আসে—কোনো মাসে দশ, কোনো মাসে পনেরো। মা ওকে ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাত বাঁধানো চুড়ি বানিয়ে দিয়েছিল দু-খানা, গলায় আছে সরু একটি সোনার চেন। এগুলো দিয়ে দিলে কি হবে? ও সঙ্গে সঙ্গে চুড়ি এবং চেন দিয়ে দেয়। বলে, 'এই দিয়ে প্রাথমিক খরচা মেটানো হোক। তারপর আমি আরও চেষ্টা করব।'

'গয়না খুলে দিলি? কী করছিস প্রীতি?'

'পিসিমা বাগড়া দিয়ো না তো। ওই জঞ্জাল দরকারের সময় কাজে না লাগলে শরীরের শোভা বাড়িয়ে কী হবে? কানুদা, তুমি স্যাকরার কাছে নিয়ে যাও। দেখো কত পাওয়া যায়।'

প্রীতিলতার কণ্ঠস্বর অনেকটা আদেশের মতো শোনায়। সবাই বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায়। কেউ আর কথা বলে না। কানু চেন আর চুড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

কদিন মহা উৎসাহে প্রীতি গান-কটন বানানোর কাজে ডুবে থাকে। খুব অল্প সময়ে প্রীতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে ফেলে। সবাই ওর ওপর খুব খুশি। ও ভেবে দেখে, কাজে মগ্ন হয়ে গেলে দুঃখ অনেক কমে যায়। তখন শংকর আস্তে আস্তে রামকৃষ্ণ, তারকেশ্বর ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

অর্ধেন্দুর পুড়ে যাওয়ার ঘটনাটি বলতে থাকে।

'তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু পিউরিক পাউডার মর্টার ও পেসেলে সংমিশ্রণ করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। মর্টারটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে আর পেসেলটি উড়ে গেছে। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু বিস্ফোরণের ধাক্কায় পাঁচ-ছয় হাত দূরে ছিটকে পড়ে। ওদের দুজনের বুক-হাত যে কেবল পুড়ে গেছে তা নয়, শরীরের খণ্ড খণ্ড মাংস উড়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে যায়। অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় দুজন ছটফট করেছে। অর্ধেন্দুর অবস্থা একটু ভালো ছিল—সে যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে একবার উঠে একটু পায়চারি করে আবার বসে পড়েছে। তিনজনের মধ্যে রামকৃষ্ণ অনেক কম আহত হয়েছিল। অন্যদের অবস্থা দেখে ও আর কথা বলতে পারছিল না। তারকেশ্বরের নড়বার শক্তি ছিল না। ওদের শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল তারকেশ্বর বুঝি মরে যাবে। অনন্তদাকে দেখে তারকেশ্বর দুঃসহ যন্ত্রণায় বলে, "অনন্তদা আপনি আমাকে গুলি করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। আমি সহ্য করতে পারছি না। গুলি করুন।" তখন অনন্তদা বললেন, "আর দেরি না করে গুলি করে ফেলি।" কী দুঃসহ অবস্থা! বিস্ফোরণের শব্দ শুনে একটু পরই হয়তো পুলিশ আসবে। প্রতিটি মুহূর্ত তো মুহূর্ত নয়, যেন বিশাল একটি জীবন ও মৃত্যু। সবাই একদম স্থবির হয়ে যাচ্ছে। ভেবেই পাচ্ছে না কোথায় ডাক্তার, কোথায় ঔষধ, কোথায় চিকিৎসা! তখন গণেশদা উত্তেজিত হয়ে বলল, "কেন বাজে কথা বলছ? ঘাবড়াবার কী আছে? বিপদ এসেছে, বিপদকে রুখতে হবে।" মাস্টারদা বললেন, "অনন্ত একে বাঁচাতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।" এই কথায় সবাই মনস্থির করে ফেলল। প্রাথমিকভাবে আমরা পিউরিক লোশন ও বোরাফেন্স মলম লাগিয়ে দিলাম। তারপর ওদেরকে মাখন ঘোষালের গাড়িতে করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল।

'জানেন একদিন অর্ধেন্দুকে দেখতে গেলাম। হাইস্কুলের সামনে রাস্তার পশ্চিম পাশে পুরনো একতলা দালানটিতে ওরা ছিল। অর্ধেন্দুকে দেখে একদম চমকে উঠলাম। বিশ্বাস হতে চায় না যে, কালো অর্ধেন্দু একদম সাদা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, পুরো শরীর থেকে চামড়া তুলে ফেলা হয়েছে। ও শরীরে মলম লাগাচ্ছিল। আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল, "বোসো। দেখ, কী সুন্দরই না হয়ে গেছি।" আমি হাসতে পারলাম না। আমার বুক পুড়ে যাচ্ছিল। অর্ধেন্দু আবার বলল, "চামড়া আর এক পরতা উঠে গেলেও আমি তোমাদের পাশে আছি। হিসেব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নিকেশের সময় আমি ঠিকই উপস্থিত থাকব।” আমার ইচ্ছে হলও যে, অর্ধেন্দুর পা ছুঁয়ে প্রণত হই। এই নইলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী! ওই মুহূর্তটি আমার জীবনের খুব মূল্যবান মুহূর্ত। ওইদিন অর্ধেন্দু জানতে পারেনি যে, আমি ওর কাছ থেকে কতটুকু নিয়েছি। কত সাহস এবং প্রেরণা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।’

প্রত্যেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শংকরের কথা শোনে। সবাই নীরব। যেন প্রত্যেকে মনে মনে আহতদের জন্য প্রার্থনা করছে। প্রত্যেকে ওদের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে চায়। গান-কটন বানানো উপলক্ষে প্রীতিলতা বেশ কিছুদিন পিসিমার বাড়িতে থেকে যায়। গান-কটন চট্টগ্রামে পাঠানো হয়ে যাবার পরও ওর হোস্টেলে ফিরতে ইচ্ছে করে না। পিসিমা হোস্টেলে ফেরার তাগাদা দেয়। বলে, ‘পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নে প্রীতি। ভালো রেজাল্ট করা চাই।’

‘ভালো রেজাল্ট দিয়ে কী হবে? শুনলে না বোমা বানাতে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে উড়ে যায় মাংসপিণ্ড! তবু ওরা আবার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।’

পিসিমা প্রীতিলতার সঙ্গে আর কথা বাড়ায় না। বুঝতে পারে যে, মেয়েটি দিন দিন একরোখা হয়ে যাচ্ছে। ওকে এখন আর কিছু না বোঝানোই উচিত। ও নিজে নিজে একটা কিছু ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। সেখান থেকে আর টলবে না।

প্রচণ্ড অস্থিরতায় প্রীতিলতা আবার নিজের ভেতর ম্রিয়মান হয়ে যায়। একসময় মনে হয় পিসিমার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে। কোনোদিন ওই মুখের ধমনিতে কোনো রক্ত প্রবাহিত হয়নি। তাঁর আত্মীয় দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির জন্য দিন গুনছে। অথচ আমি থাকব, পিসিমা থাকবে—প্রতিদিন ফুল ফুটবে, চাঁদ উঠবে, ঘাসগুলো সবুজ হয়ে থাকবে। কিন্তু রামকৃষ্ণ থাকবে না, দীনেশ গুপ্ত থাকবে না। এ কেমন করে সম্ভব? ওর দীপ্ত চাউনিতে পিসিমা বিচলিত বোধ করে।

‘কীরে, কী হল?’

ও পিসিমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়—‘পিসিমা হওয়ার তো কিছু বাকি নেই। আরো কিছু হওয়াতে চাই। আমি যাচ্ছি হোস্টেলে।’

প্রীতিলতা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসে। তখন খাঁ-খাঁ দুপুর। কড়া রোদ পুড়িয়ে দেয় চামড়া। রাস্তায় তেমন গাড়িঘোড়া নেই, পথচারীও কম। প্রশস্ত রাজপথের দিকে তাকিয়ে প্রীতিলতার চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

জলে ভরে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১১

প্রীতিলতা আজও লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরেছে। সঙ্গে লাল ব্লাউজ। কপালে টিপ। স্নিগ্ধ, মোহনীয় দেখাচ্ছিল ওকে। তবু রামকৃষ্ণ বলে, 'সকাল থেকে ভেবেছি প্রীতি, সারা জীবন তোমাকে এই দুঃখ একা একা বয়ে যেতে হবে।'

'জীবন ক-দিনের? আমারও মৃত্যু হতে পারে কোনো দুর্ঘটনায় কিংবা কোনো অসুখে, তোমারই আগে? আমরাতো জানি না আমার জীবনে কখন মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে?'

প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠ উপেক্ষা করে বলে, 'যখন এই দুঃখ একা-একা আর বওয়া যাবে না, তখন জীবন শেষ হয়ে আসবে। জীবন ক-দিনের এই হিসেব করে লাভ কি?'

'প্রীতি খবর এসেছে যে, আমার মা মারা গেছেন।'

'মা? তোমার মা?'

প্রীতিলতা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। খবরটা কত সহজে রামকৃষ্ণ ওকে দিচ্ছে। এখন ওকে কী সান্ত্বনা দেবে? পাগল, এমন লোককে সান্ত্বনার কথা না বলাই ভালো।

'জানো, আমার মা তোমার মতো লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরতে পছন্দ করতেন। কপালে জ্বলজ্বল করত টকটকে লাল সিঁদুর। কী সুন্দর যে লাগত মাকে! হাতে ছিল সোনার দুগাছি চুড়ি এবং গলায় সরু চেন। ঠিক তোমার মতো।'

রামকৃষ্ণের কণ্ঠে খানিকটা উদাসীনতা টের পায় প্রীতিলতা। ও ততক্ষণে ভুরু কুঁচকে প্রীতিলতার দিকে তাকিয়ে আছে। বলে, 'তোমার চুড়ি এবং চেন কই?'

'এসব থাক। তুমি মায়ের কথা বল।'

'আমি জেলে থাকতেই বাবা মারা গেছেন। তাই মায়ের বৈধব্য আমাকে দেখতে হয়নি। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হয়তো মায়ের ওই নিরাভরণ রূপ দেখতে পারতাম না। কিন্তু আমি তোমাকেও নিরাভরণ দেখতে চাই না। কেন খুলেছ চুড়ি আর চেন?'

প্রীতিলতা চুপ করে থাকে। রামকৃষ্ণের সামনে কোনো মিথ্যে ও বলবে না। তাছাড়া গান-কটনের রাসায়নিক কেনার জন্য গয়না দেওয়া রামকৃষ্ণের কাছে কোনো বড়ো ঘটনা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে মার প্রসঙ্গ আসায় প্রীতিলতা বিব্রত বোধ করে। নিজের নিরাভরণ হাত দুটো বৈধব্যের প্রতিমূর্তি হয়ে ওর সামনে ভেসে ওঠে। কেন যে প্রতি মুহূর্তে হৃদয় এমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়!

'কথা বলছ না কেন প্রীতি?'

'গয়নাগুলো বিক্রি করে দিয়ে গান-কটন তৈরি করার জন্য রাসায়নিক কেনা হয়েছে। আমাদের অর্থের খুব দরকার ছিল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা গান-কটন বানাতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই মাস্টারদা নির্দেশ দিয়েছিলেন, কলকাতার অভিজ্ঞ সদস্যদের দিয়ে গান-কটন বানিয়ে পাঠাতে। আমিও বানাতে শিখেছি।'

'আহ্, কী আনন্দ! এই খবরটা তুমি এতক্ষণ আমাকে বলোনি? প্রীতি, আমি কী যে খুশি হয়েছি, তুমি গান-কটন বানাতে শিখেছ!'

প্রীতিলতা তৃপ্তির হাসি হাসে। খুশিতে রামকৃষ্ণের চোখ জ্বলজ্বল করে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা কেটে গিয়ে ফুটে ওঠে আলোকোজ্জ্বল তটরেখা। প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে বলে, 'আমি জানতাম তুমি খুশি হবে।'

'তোমাকে আমি বলিনি প্রীতি যে, বোমা বানাতে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমি পুড়ে গিয়েছিলাম। বুক, হাত, মুখের কিছু অংশ ঝলসে গিয়েছিল।'

'ওহ্'—প্রীতিলতার অস্ফুট আর্তনাদ। তারপর ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করে রামকৃষ্ণের চোখে চোখ রেখে বলে, 'ঘটনাটি আমি ক-দিন আগে শুনেছি।'

প্রীতিলতার আর্তনাদের শব্দ ধরেই রামকৃষ্ণ বলে, 'আর্তনাদ আমার বুকেও গুমরে মরে। এও আমার এক ব্যর্থতার কাহিনি। তখন চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার দখলের প্রস্তুতি চলছে। নানা অস্ত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সজ্জিত হচ্ছি আমরা। জোগাড় হয়েছে সাতটা গুলিওয়ালা পিস্তল, ছয়টা ছোটো ছোটো রিভলবার, ডেগার ও ভোজালি ছিল চল্লিশটি। একটা বোমা ছিল বত্রিশটা বুলেটের সমান—খাঁজ কাটা সেল ফাটলে বত্রিশটি লোহার টুকরো বুলেটের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়া এগারোটা লাইসেন্স করা ব্রিজলোডার বন্দুক জোগাড় হয়েছিল। দলীয় সদস্যরা বাড়ি থেকে গোপনে বন্দুকগুলো নিয়ে এসে পার্টির হেফাজতে দিয়ে দেয়। একই সঙ্গে আমরা বোমা তৈরির কাজ করছি। পিউরিক অ্যাসিড কেনা হয়, পিউরিক পাউডার তৈরি হয় এবং খোলে ঢুকিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। একদিন ঘটে গেল বিস্ফোরণ। পুড়ে গেলাম আমি। অসহ্য যন্ত্রণা। চিৎকার করতে পারি না। পাছে কেউ শুনে ফেলে। অনন্তদার কাছে খবর নিয়ে ছুটে গেল লোক। বেলা তিনটেয় অনন্তদা গাড়ি নিয়ে এলেন। অর্ধদগ্ধ অবস্থায় গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সঙ্গে ছিল নরেশ। অনন্তদার বেবি অস্টিন ছুটছে। কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে? গোপন জায়গা তো ঠিক করা নেই। প্রতিটি মুহূর্ত তো মুহূর্ত নয়, যেন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। নরেশ আমার প্রাথমিক চিকিৎসা করেছে। মলম লাগানো হয়েছে। কিন্তু ওরা ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে বার বার ডাক্তারের কথা বলছে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত দু-দিনের জন্য একজন সমর্থকের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া গেল। একজনকে আমার দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল। গণেশদা কোনো বড়ো ডাক্তারকে দেখিয়ে আমার চিকিৎসা করাবেন বলে মনস্থ করলেন। গোপনে গোপনে ডাক্তার এল, চিকিৎসা চলল। ঘন ঘন বাসা বদলাতে হচ্ছে। কারণ আমার ভগ্নিপতি সরকারি চাকরি করতেন। তিনি পুলিশকে সব কথা বলে দিলেন।

'পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন ডাক্তারখানায় ও ডাক্তারবাবুদের কাছে প্রশ্ন করে পুলিশ জানতে চাইল যে, চোদ্দো মার্চ দোলযাত্রার দিন তাঁদের ডিসপেনসারিতে বা কারো বাড়িতে গিয়ে তাঁরা কেউ কোনো বিস্ফোরণে আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেছেন কিনা। জগদা ডাক্তার ছিলেন আমাদের শুভানুধ্যায়ী। দশ-বারো দিন পর তাঁর কাছে পুলিশ গেলে তিনি বললেন, যে অগ্নিদগ্ধ একজনকে তিনি চিকিৎসা করেছেন তবে সে লুচি ভাজার সময় দুর্ঘটনায় পুড়ে গেছে। যাই হোক এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার অন্যত্র সরানো হল। একদিকে চিকিৎসা আর অন্যদিকে উৎকণ্ঠা আর পলায়ন। শারীরিক-মানসিক দু-দিক থেকেই পোড়-খাওয়া অবস্থা। এদিকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অধীনে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। জোর তল্লাশি চলছে। তার ওপর আবার বাড়ি বদলানোর বিপদ। নেতারা তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ঠিক করেছেন যে, আমাকে কর্ণফুলির অপর পারে এক গ্রামে রাখা হবে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করে একদিন রাতের অন্ধকারে আমি নদী পেরিয়ে চলে গেলাম সেই গ্রামে। চাঁদপুরের ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত আমি পলাতক জীবনযাপন করেছি। ধীরে ধীরে সুস্থ হলাম ঠিকই। কিন্তু মনের ঘা আর শুকোল না।'

'মনের ঘা আবার কেন?' প্রীতিলতা আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করে।

'মনের ঘা কেন নয়? বিস্ফোরণে পুড়ে না গেলে তো অস্ত্রাগার দখল অভিযানে অংশ নিতে পারতাম। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধেও থাকতে পারতাম। এই ব্যর্থতা কোনোভাবেই পুষিয়ে দেওয়া যায় না।'

'এটা কখনোই ব্যর্থতা নয়, এটা দুর্ঘটনা। এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই।'

প্রীতিলতা জোর দিয়ে বলে। রামকৃষ্ণ না-সূচক মাথা নাড়ে। বলে, 'দূর থেকে দেখলে এমনই মনে হয়। কাজের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে নিজেকে খুব অপরাধী লাগে।'

'যদি তাই মনে হয় তাহলে সব ব্যর্থতার দায়ভার আমি তো নিয়েছি। দুঃখ কী?'

'দুঃখ নেই। একটুও দুঃখ না। এখন থেকে তুমি আমার বৃষ্টি। আমি তোমাকে বৃষ্টি বলে ডাকব।'

'তাই ডেকো, তাই ডেকো।' প্রীতিলতা গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করে।

'শরীর পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা আমি পেয়েছি এবং মন পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণাও। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় এই পুড়ে যাওয়া ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ। আমি বীরের মতো মরতে চেয়েছি। এই মৃত্যুর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভালোবাসা। আমার কোনো দুঃখ নেই, কোনো ক্ষত নেই। ফাঁসির মঞ্চে পা দিলেই তো সেটা আমার দেশ হয়ে যাবে। আমি বন্দনা সঙ্গীত গাইতে গাইতে এ দেশের ওপর দিয়ে হেঁটে যাব। তুমি তো আমার সঙ্গে আছ বৃষ্টি।'

'আহ্ প্রফুল্ল!' রামকৃষ্ণ কয়েকবার নামটি উচ্চারণ করে। পুলিশ সাব-ইনস্পেকটর নন্দলাল ব্যানার্জির হাতে ও যেদিন ধরা পড়ল সেদিন কী প্রবল ঘৃণায় ফুঁসে উঠেছিল প্রফুল্ল। নন্দলালকে বলল, 'বাঙালি হয়ে একজন বাঙালিকে আপনি ধরিয়ে দিলেন। তাহলে দেখুন, বাঙালি কত সহজে মরতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রামকৃষ্ণের কাছ থেকে পরের কথাটা নিজের ঠোঁটে তুলে নেয় প্রীতিলতা। বলে, 'এই কথা বলে নিজের পিস্তল দিয়ে নিজের কপালে গুলি ছোঁড়ে প্রফুল্ল। মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ে তার শরীর। তারপর প্রফুল্লর লাশ মজফফরপুরে আনা হল ক্ষুদিরামের কাছে শনাক্তকরণের জন্য। শোকাচ্ছন্ন ক্ষুদিরাম বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ ইনি আমার সঙ্গী দীনেশ রায়।" প্রফুল্লর ছদ্মনাম ছিল দীনেশ। ক্ষুদিরাম শনাক্ত করার পরে প্রফুল্লর মাথা বিচ্ছিন্ন করে কলকাতায় পাঠানো হয়।'

'পরেরটুকু আমি বলি? বিশ্বাসঘাতক নন্দলালকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় শ্রীশ পাল ও রণেন গাঙ্গুলির অব্যর্থ গুলিতে প্রাণ দিয়ে।'

প্রীতিলতা বলে, 'আমাদের কী অপূর্ব স্মৃতিচারণ!'

'না বৃষ্টি, শুধু স্মৃতিচারণ নয়। এ আমাদের ঐতিহ্য। আমরা এদের উত্তরাধিকারী। তাই তো বলতে ইচ্ছে করে, সার্থক জনম আমার। জন্মেছি এই দেশে।'

'বৃষ্টি, সেদিন ক্ষুদিরামের পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়িয়েছিলেন মজফফরপুরের আইনজীবী কালিদাস বসু। বিচারে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ৩০২ ধারায় বিদেশি বিচারক ক্ষুদিরামকে প্রাণদণ্ড দিলেন। কালিদাস বসু আপিল করলেন কলকাতা হাইকোর্টে। হেরে গেলেন তিনি। প্রাণদণ্ড বহাল রইল। তিনি বড়োলাটের কাছে ক্ষুদিরামের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হল। মানুষই তো মানুষের প্রাণভিক্ষা চায়। বৃষ্টি, সেই প্রাণ—যে প্রাণ একদিন মায়ের কোলে খুশির উত্তাল বন্যা বইয়েছিল। ওর জন্মের আগে পরপর দুটো ভাই মারা গেছে। তিন বোন বেঁচে আছে। কেঁপে ওঠে মায়ের মন। যদি এ ছেলেটিও মরে যায়! তাই তিন মুঠো ক্ষুদের বিনিময়ে মা তার বড়ো মেয়ে অপরূপার কাছে ছেলেকে বিক্রির ভান করে। সেই থেকে নাম রাখা হয় 'ক্ষুদিরাম'। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! কৈশোরের মধ্যেই প্রথমে মা গেল, তারপর বাবা। ক্ষুদিরাম থাকতে গেল বড়ো বোন অপরূপার সংসারে। কিন্তু ভগ্নিপতি সইতে পারল না শ্যালককে। বলল—"ও স্বদেশি। ও সত্যেন বাবুর আখড়ায় ছোরা আর লাঠি খেলায় নাম করেছে। ও একজন বিপজ্জনক মানুষ। আমার সংসার নষ্ট হবে।"

'সুতরাং ক্ষুদিরামকে নামতে হল রাস্তায়। পথের ডাক তো ওর প্রাণের ভেতর। ও পথকে ভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পায় না। যেখানে যায়, সেখানেই নিজের ঘর গড়ে তোলে। এক দিদির সংসারে ঠাঁই না মিললে কী হবে, আরও তো মানুষ আছে। উকিল সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদের বোন তার পাতানো দিদি হল। একদিন সেখান থেকেও উধাও হয়ে গেল ক্ষুদিরাম। পাতানো দিদি তাকে খুঁজে সারা। একদিন খোঁজ পাওয়া গেল। দেখা গেল, ও ঘর পেয়েছে। এবার শ্রীঘর। মজফফরপুর জেলে ও তখন ফাঁসির আসামি। মাত্র সতেরো বছর বয়স। কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে ওদের বোমার আঘাতে নিহত হয়েছে ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী আর মেয়ে। মৃত্যুর আগে আপন দিদিকে দেখতে চেয়েছিল। ভগ্নিপতির কড়া শাসনে দিদির কোনো উপায় ছিল না। শেষবারের মতো দিদিকে তার দেখা হয়নি। কিন্তু তার পাতানো দিদি তাকে দেখতে গিয়েছিল মজফফরপুরে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এমন। সেটা যে কীভাবে কোথা দিয়ে গজিয়ে উঠবে, কেউ জানে না।'

প্রীতিলতা থামিয়ে দেয় রামকৃষ্ণকে—'এখন বুঝতে পারছি কেন ওই মুসলিম দিদি সব ভয় তুচ্ছ করে ক্ষুদিরামকে দেখতে গিয়েছিল। কারণ, শুধু এই ভালোবাসা। এই ভালোবাসার টান দিয়েই মানুষ মানুষের প্রাণের কাছে পৌঁছয়। সেখানে রক্তের টান থাকার দরকার নেই—একই মায়ের গর্ভের দরকার নেই—একই ধর্মের মানুষ হওয়ারও দরকার নেই।'

'ঠিকই বলেছ। একদম ঠিক।'

নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রীতি শেষ করে। 'দেশ ও মানুষের জন্য প্রবল ভালোবাসা ছিল বলেই ক্ষুদিরাম অমন হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে।'

'আহ্, ক্ষুদিরাম। আমার প্রাণপুরুষ।' রামকৃষ্ণ স্বগতের মতো বলে।

প্রীতিলতা লোহার শিকের ওপরে রামকৃষ্ণের তর্জনির ওপরে নিজের তর্জনি রাখে।

রামকৃষ্ণ নিজের তর্জনির ওপরে প্রীতিলতার তর্জনির ছোঁয়া নিয়ে বলে, 'বৃষ্টি, আমি ক-দিন ধরে ভাবছি, হাইকোর্ট তো আমার দণ্ড বহাল রেখেছে। প্রিভি কাউন্সিলে মামলা চলছে। মাসের পর মাস গড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমি জানি ফলাফল একই থাকবে। আমি ক্ষুদিরামের সাধনায় মেতেছি। আমি ওর মতো হাসিমুখে মরতে চাই। মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার পরও ক্ষুদিরাম হাসছিল। বিচারের এই রায় শোনার পর ওকে নির্বিকার দেখে স্বদেশি বিচারক ভেবেছিল, ক্ষুদিরামকে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দণ্ড দেওয়া হয়েছে ও বুঝি তা বুঝতে পারেনি। তখন বিচারক ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করে, "তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?" ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ বুঝিয়াছি।" বৃষ্টি, সেই তারিখের 'অমৃতবাজার' পত্রিকা লিখেছিল, 'মজফফরপুর, ১১ আগস্ট—অদ্য ভোর ছয়টার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্লচিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমনকী তাহার মাথার উপর যখন টুপিটা টানিয়া দেওয়া হইল, তখনো সে হাসিতেছিল।' সরকারি পত্রিকা 'দ্য এম্পায়ার'-ও মন্তব্য করে যে, 'হি ওয়াজ চিয়ারফুল অ্যান্ড স্মাইলিং।' আমিও মৃত্যুকে এভাবেই জয় করতে চাই বৃষ্টি। ক্ষুদিরাম ১৯০৮ সালে পেরেছিল। এখন ১৯৩১। সময় কত এগিয়েছে। আমিও পারব।'

'আহ্, আর বোলো না। আমার খারাপ লাগছে।'

প্রীতিলতা দুহাতে মুখ ঢাকে।

'আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। আমরা আমাদের গৌরবকে স্মরণ করছি নতুন শক্তি অর্জনের জন্য।'

'আর কত শক্তির প্রয়োজন? কত? সবটুকু শক্তি আমাদের আছে।'

'আছেই তো।'

'তোমার পুড়ে যাওয়া বুকটা আমাকে দেখাও।'

'কেন, খারাপ কিছু দেখতে চাও?'

'খারাপ? কীসের খারাপ? এ তো আমার কাছে একটা পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন। তুমি যখন থাকবে না তখন ওই চিহ্নটুকু আমার চোখজুড়ে ভেসে থাকবে।'

'আকাশে যেমন মেঘ, বাতাসে যেমন ধূলিকণা তেমন কি? নাকি নীলিমার অপর পারের কিছু?' কথা বলতে বলতে রামকৃষ্ণ গায়ের চাদর সরায়। বোতাম খুলে দেয় ফতুয়ার। উন্মুক্ত হয় একটি দৃশ্য।

প্রীতিলতা বিস্মিত হয়ে বলে, 'মনে হয় তোমার বুকের ওপর একটি মানচিত্র আঁকা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আছে।'

রামকৃষ্ণ আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কোথাকার মানচিত্র? কেমন তা? দেশের, না মহাদেশের?'

'কৃষ্ণ, এ তো আমাদেরই দেশ।'

'এই চিহ্নটুকু তুমি যেমন করে দেখলে, আমিও তা তেমন করে দেখতে পারিনি। অন্য কেউও পারেনি। তুমি অনেক বড়ো বৃষ্টি।'

'আমি তো দেখবই। আমার যে একটা অবলম্বন চাই। যা হৃদয়ের, যা অদৃশ্য, তাকে নিয়ে এক ধরনের সুখ। যা বস্তুগত, যা দৃশ্যমান, তা অন্য ধরনের সুখ। সবই তো আমার রইল।'

তখন সেপাই এসে কাছে দাঁড়ায়—'আপনাদের সময় হয়ে গেছে।'

প্রীতিলতা রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'সময় তো হবেই। সময় হয়ে যায়। আমাদের কোনো হাত নেই সময়ের ওপর।'

রামকৃষ্ণ বলে, 'ঠিকই বলেছ। আমাদের কোনো হাত নেই সময়ের ওপর। পারলে থামিয়ে দিতাম কালের চাকা। মহাকালকে বলতাম, আমার এবং বৃষ্টির জন্য দু-দণ্ড দাঁড়াও। আমরা পরস্পরকে আরো একটু দেখি। আরো কিছুক্ষণ ভালোবেসে যেতে চাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১২

দৈনিক পত্রিকায় খবরটা পড়ে চমকিত হয়ে যায় প্রীতিলতা। উত্তেজনায় ওর শরীর থরথর করে কাঁপে। গতকাল বিশেষ আদালতের প্রেসিডেন্ট মি গার্লিককে কোর্টে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

প্রীতিলতা জানত কলকাতা পার্টি অফিস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, রামকৃষ্ণ এবং দীনেশের ফাঁসির আগে গার্লিককে হত্যা করা হবে। এই দুইজন মৃত্যুপথযাত্রী যেন জেনে যেতে পারে যে, গার্লিককে খতম করা হয়েছে। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে এটাই হবে ওদের জন্য উপহার।

ঠিক দুপুরবেলা গার্লিক যখন বিচারকের আসনে বসে কোর্টের কাজ করে যাচ্ছে, তখন একজন তরুণ কোর্টে ঢুকে গার্লিকের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। গার্লিক সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। ওই তরুণটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কপালে গুলি করে। উড়ে যায় মাথার খুলি। ছিটকে পড়ে মগজ।

প্রীতিলতা কাগজটা মুড়ে বিছানার ওপর রাখে। ভাবে, কেবল তো দৃষ্টান্ত স্থাপিত হচ্ছে। তাহলে হয়তো আমাদের সাফল্য বেশি দূরে নয়। আমরা হয়তো স্বাধীনতার দোরগোড়ায় এসে গেছি। ও বেশ উৎফুল্ল বোধ করে। ইচ্ছে হয়, এই মৃত্যুকে নিয়ে কবিতা লিখতে। কাগজ নিয়ে বসে। কিন্তু হয়ে ওঠে না।

সেদিন পিসিমা আসে ওর হোস্টেলে।

‘খবর শুনেছিস?’

‘হ্যাঁ, পিসিমা।’

পিসিমা হাতব্যাগ খুলে প্রীতিলতাকে রামকৃষ্ণের ছবি দেয়।

‘ছবি কোথায় পেলে পিসিমা?’

‘সেকথা বলব কেন? খুশি হয়েছিস তো?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘সাতরাজার ধন পেলেও বুঝি এত খুশি হতাম না। তুমি আমার জন্য অসাধ্য সাধন করেছ। কী সুন্দর ছবি!’

‘লুকিয়ে রাখিস। কেউ যেন না দেখে।’

‘তোমার জন্য চা করি পিসিমা?’

‘না রে আজ থাক। অন্য জায়গায় যাব। তাড়া আছে। পড়ালেখা ঠিকমতো করছিস তো?’

‘কেন যে পড়তে বলো।’

‘যাই রে।’

পিসিমা কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।

বুকের নীচে বালিশ চেপে বিছানায় উপুড় হয়ে ছবিটা সামনে রাখে ও। দেখে তৃষ্ণা ফুরোয় না। তারপর ডায়রি বের করে লেখে—ইচ্ছে হয় প্রতিদিন তোমার কাছে যাই। প্রতিদিন। তুমি যদি কথা না বলো তবে চুপচাপ বসে থাকি সামনে। দেখতে চাই তুমি কেমন করে নিঃশ্বাস নাও, কেমন করে চোখের পাতা ফেলো, তোমার চোখের কালো মণি ইতস্তত কোথায় ঘোরে। দেখতে ইচ্ছে করে তোমার ঠোঁটটা কতটা ভিজে থাকে। সেই ঠোঁট জোড়া পাখি হয়ে উড়ে আসে না কেন আমার কাছে? জেলের ঘণ্টায় ঢং ঢং শব্দ হলে তুমি চমকে ওঠ। আমার দিকে তাকাও। ভাব, হয়তো এখন আমার যাবার সময়। আমার কোনো যাবার সময় নেই। আমি তোমার কাছেই আছি।

লেখা আর হয় না। প্রবল আবেগে ছবিটা চুমুতে ভরে দেয়। তারপর ডায়রির ভেতর রেখে তোরঙ্গে উঠিয়ে রাখে।

পরদিন কলেজে গিয়ে দরখাস্ত দেয় যে, ও অনার্স পরীক্ষা দেবে না। অধ্যক্ষ চোখ গোল করে তাকায়—‘কী বললে, পরীক্ষা দেবে না!’

ও অবিচল কণ্ঠে বলে, ‘না।’

‘কেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ও চুপ করে থাকে। কেন তা অধ্যক্ষকে বলবে কীভাবে?

'আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। যাও পড়ালেখা করো গে।'

প্রীতিলতা যাবার আগে বলে, 'বাট দিস ইজ ফাইনাল।'

অধ্যক্ষ কটমট করে তাকায়। প্রীতিলতা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। মনে মনে বলে, স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠা করার বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পাদনই আজ মুখ্য। পরীক্ষা পাস এর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার।

ওর সিদ্ধান্তের কথা শুনে কুমুদিনী লাফিয়ে ওঠে—'এ হয় না প্রীতি। এ হয় না। তুই এমন এক ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী, তুই এসব কী ভাবছিস?'

'মেধা জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল খাব ঠিক করেছি। একটা কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। বল দেখি কেন হবে না?'

'পরীক্ষা পাস করেও তো তুই বিপ্লবী কাজে বেশি করে নিয়োজিত হতে পারবি। পরীক্ষার সঙ্গে বিপ্লবের বৈরিতা কোথায়?'

'তোদের এইসব উপদেশ শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমি চাই না যে, আমাকে কেউ জোর করুক।'

'কিন্তু তোর কাছে একটাই অনুরোধ প্রীতি। অনার্স পরীক্ষা না দিস ঠিক আছে, বিএ পরীক্ষাটা পাস করে নে।'

'ঠিক আছে ভেবে দেখব। নইলে বাবা-মাও মন খারাপ করবে। বাবা-মাকে দুঃখ দিতে চাই না।'

'দু-বছর অনার্স পড়লি। টাকা-পয়সাও খরচ হল। অনার্স পরীক্ষা না দেওয়া কি ঠিক হবে?'

'বুঝেছি বুঝেছি। আর বলতে হবে না। সবাই মিলে এই পুথিগত বিদ্যাটা আমাকে না গিলিয়ে ছাড়বি না। তবে বিএ পরীক্ষাটা আমি দিয়ে দেব। একটা পাসই তো মাত্র। পড়ালেখা না করলেও চলবে। বাবা-মাকে দুঃখ দিতে চাই না যে, বাবা-মা এমন খবর সহ্য করতে পারবে না। তখন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়? ঠিক আছে বিএ পাস করব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘যাক, বাবা-মার কথায় যদি তোর মাথা ঠিক থাকে।’

কুমুদিনীর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে প্রীতিলতার নিজেকে একজন মুক্ত মানুষ মনে হয়। এখন পাখির মতো হালকা শরীর। ইচ্ছে করলে নিলীমায় উড়ে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১৩

প্রীতিলতা যখন এল, তখন রামকৃষ্ণের গায়ে খুব জ্বর। আবার ম্যালেরিয়া। ও প্রীতিলতার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, 'আজ সত্যিই জ্বর।'

'দেখি।'

প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের কপালে হাত রাখে।

'ইস্, গা পুড়ে যাচ্ছে।'

'মাথাও কেমন ঝিম ধরে আছে। শরীর খারাপ লাগছে।'

'আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।'

প্রীতিলতা নিজের আঙুল কামড়ে ধরে।

'ইচ্ছে হয়, তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকি। ইচ্ছে হয়, তোমার হাতটা বুকের ওপর চেপে ধরি। এটুকই শান্তি। এটুকুই স্বস্তি।'

লোহার শিক দু-হাতে চেপে প্রীতিলতা কপাল রাখে। ওর বুক ফেটে যায়। ও কথা বলতে পারে না। সময় চলে যায়।

সেপাই এসে সামনে দাঁড়ায়—'আপনাদের সময় শেষ। এখন যেতে হবে।'

'শেষ? কী বললেন সময় শেষ?'

সেপাই দাঁড়ায় না। নিজের টুলে গিয়ে বসে।

প্রীতিলতার আয়ত চোখ জলে ভরে ওঠে।

'আমাদের সময় শেষ কৃষ্ণ।'

জ্বরের ঘোরে রামকৃষ্ণের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে থাকে, তা নিষ্প্রভ এবং ম্লান। ও বেশি কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পারে না।

প্রীতিলতা আবার বলে, 'আমাদের সময় শেষ কৃষ্ণ। আমি যাই।'

রামকৃষ্ণ ঘাড় নাড়ে। ব্যাকুল দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রীতিলতার পদক্ষেপ।

সর্বোচ্চ বিচারালয় প্রিভি কাউন্সিল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ড অর্থাৎ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। খবরটা প্রীতিলতাকে বজ্রাঘাতে স্তব্ধ করে দেয়। বরাবরের মতো রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইতে গিয়েছিল ও। পরিবর্তে জেনে এল, যে-কোনোদিন রামকৃষ্ণের ফাঁসি কার্যকর হবে।

আর কোনোদিন প্রীতিলতার সঙ্গে দেখা হবে না ওর। ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে ও। আজ আর কিছুতেই চোখে জল আসে না। রাস্তায় বেরিয়ে এলে চোখ জ্বালা করে। প্রতিদিনের মতো রাস্তার চারদিকে তাকাতে পারছে না। কোথায় যাবে ভাবতে থাকে। ভেবে সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। বারবারই রামকৃষ্ণের জ্বর-আক্রান্ত মুখটা চোখের জল শুষে নেয়। ও এলোমেলো হাঁটার কথা ভাবে। পরক্ষণে ভাবে পিসিমার ওখানে যাবে। কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। পথচারীরা যে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়, সেটা খেয়াল করে না। খানিক দূর পায়ে হেঁটে এগোয়। তারপর বাসে ওঠে। হোস্টেলে ফিরবে বলে ঠিক করে। এখন নিজের জন্য কিছুটা সময় একলা রাখাই দরকার। হোস্টেলের বাগান থেকে একটি লাল গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে ঘরে ঢোকে। কাপে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখে।

কদিন পর খবর পায় বারবার ম্যালেরিয়া হচ্ছে বলে রামকৃষ্ণের ফাঁসি দু-বার স্থগিত হয়েছে। ব্রিটিশের আইন হল, অসুস্থকে সুস্থ করে ফাঁসি দিতে হবে। এদিকে রামকৃষ্ণের ফাঁসির বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় খুব লেখালেখি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনেও অসন্তোষ। পত্রিকাগুলো ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করছে। ফাঁসি মওকুফের জন্য জোর দাবি উঠেছে।

প্রীতিলতার গোলাপের কুঁড়ি কাপের জলে পাপড়ি মেলে ঝরে যায়। ও আবার নতুন একটি কুঁড়ি সংগ্রহ করে। ডায়রিতে লেখে , আমি প্রতিদিন আমার টেবিলে গোলাপ কুঁড়ি জলে ভিজিয়ে রাখি। যেদিন তোমার মৃত্যু হবে, সেদিন যেন ওই কুঁড়িটি প্রস্ফুটিত হয়। তার সৌরভে যেন ভরে যায় এই ঘর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

জেলের মধ্যে গোপনেই অসুস্থ রামকৃষ্ণকে ফাঁসি দেওয়ার দিন ঠিক হয়ে যায়। বাইরের ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের মুখে এই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া। রামকৃষ্ণকে সুস্থ হওয়ারও সময় দেওয়া হয় না। সময় ঠিক হয় রাত বারোটা। খানিক আগে ফাঁসির মহড়া চলতে থাকে। দড়ি ঝোলাবার লোহার বিমগুলো প্লাটফরমে লাগানো হয়। রামকৃষ্ণের সমান ওজনের বালির বস্তা নিয়ে ফাঁসি দেবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। মঞ্চও ঠিকঠাক করা হয়। বিজলি বাতি লাগিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করা হয়। তখন বজ্রনিনাদে ঘোষিত হয় রামকৃষ্ণের কণ্ঠ—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম।

সে কণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় কারাগারের দেওয়ালে দেওয়ালে। হাতে হাতকড়া এবং বেড়ি-পরানো অবস্থায় কালো কাপড়ের মুখোশ পরিয়ে রামকৃষ্ণকে প্লাটফরমে নিয়ে তোলা হয়। ও 'বন্দে' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফরমে লিভার টেনে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে একটা গুলির শব্দ হয়।

রামকৃষ্ণ আর নেই।

রাতের অন্ধকারেই জেলের ভেতর তড়িঘড়ি শবদাহ হয়ে যায়।

এরপর থেকে প্রীতিলতা খুব নির্মোহ দৃষ্টিতে ডায়রি লেখে। আবেগহীন সাদামাটা কথা। কোনো উচ্ছ্বাস না, যেন সৌম্য-শান্ত হয়ে গেছে ওর হৃদয়। মাঝে মাঝে আনমনা থাকে—উদাস হয়ে যায় দৃষ্টি। কেউ বুঝতে পারে না, প্রীতিলতার হৃদয়ের কোন তন্ত্রী কোথায় কীভাবে ছিঁড়ে গেছে। ডায়রিতে নিজের লেখাগুলোর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর একসময় সক্রিয় হয়ে যায় ওর কলম—"বিপ্লবীদের জনৈক সহযাত্রী যখন আমাকে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার অপরাধে ব্রিটিশ আইনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন, তখন আমি এক নতুন প্রেরণার শিহরণ বোধ করলাম। আমি তার এক সম্পর্কিত বোন হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে কোনোমতে এই হাস্যময় তরুণ বীরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি জোগাড় করি। তাঁর ফাঁসির আগে তার সঙ্গে আমার প্রায় চল্লিশবার দেখা হয়েছে। তাঁর সুসংহত দৃষ্টি, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, শিশুসুলভ সারল্য, আবেগপূর্ণ অন্তর, গভীর জ্ঞান ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আমি আগের চেয়ে আরও দশগুণ বেশি শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা তার কাছ থেকে পাই। আমার জীবনাদর্শকে ফাঁসির পরই কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বাস্তব বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্য তার সাহচর্য আমাকে খুব সাহায্য করেছে। রামকৃষ্ণের ফাঁসির পরই কোনো বাস্তব বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্য আমার মনে বিশেষ আগ্রহ জাগে। কিন্তু বিএ পাস করার জন্য আরও নয় মাস আমাকে কলকাতায় অপেক্ষা করতে হবে। টেস্ট পরীক্ষার পর আমি বিপ্লবী কাজে যোগদান সম্পর্কে আলাপের জন্য একবার চট্টগ্রামে আসি।”

এটুকু লিখে কলম বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে প্রীতিলতা। বাইরে থেকে বাতাস এসে ডায়রির পৃষ্ঠা উলটে ফেলে। প্রীতিলতা থুতনির নীচে করতল রাখলে টের পায়, চোখের জল স্রোতের মতো বইছে। কোনো বাধ মানছে না।

তখন প্রীতিলতার দু - কান ভরে বেজে ওঠে ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ। ট্রেনটা চাঁদপুর পেরিয়ে চলে যায় চট্টগ্রামের দিকে। ও দেখতে পায় একজন মানুষ লাল র□্যাপার গায়ে জড়িয়ে রেললাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছে। কুয়াশায়-রোদে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর। ধূলি-ধূসরিত পা—তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়। মানুষটি চট্টগ্রামে পৌঁছতে চায়। চট্টগ্রাম ওর প্রিয় জায়গা—সেখানে পৌঁছতে পারলে ওর আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু মানুষটির চট্টগ্রাম আর পৌঁছনো হয় না। অস্ত্রধারী লোকেরা ওকে পথ থেকে তুলে নিয়ে আসে—নিয়ে যায় ভিন্ন জায়গায়—পাঠিয়ে দেয় জীবনের অপর পারে। কিন্তু ওর ফেলে যাওয়া কাজটুকু শেষ করতে হবে। তাই প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামে পৌঁছোতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কতবারই তো এই ট্রেনে করে চট্টগ্রামে আসা-যাওয়া করেছে। কখনো এমন শূন্য মনে হয়নি চারদিকে। আজ ট্রেনের কু-উ-ঝিকঝিক শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে, কলকাতা থেকে এই তার শেষ যাত্রা। আর কখনো এখানে আসা হবে না।

ট্রেনের দুলুনিতে চোখ বুজে থাকে। আবার চোখ খোলে। মাস্টারদার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বুঝি। বোমার খোল আনতে হবে। একসঙ্গে অনেক কয়টি। ততদিনে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, সরোজিনী পাল, নলিনী পাল আর কুমুদিনী রক্ষিতকে নিয়ে 'চক্র' নাম দিয়ে দল গড়েছে। সঙ্গে আরও কয়েকজন ছাত্রী যোগ দিয়েছে। একবার ওরা পাঁচজন পাঁচটি করে মোট কুড়িটি খোল নিয়ে গিয়েছিল চট্টগ্রামে। বিপ্লবীরা খুব খুশি হয়েছিল। সেই উজ্জ্বল মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

নিজেকে সক্রিয় করার জন্য ও আবার নড়েচড়ে বসে। চোখ খুলে রাখে, বাড়ির কথা মনে করে। বাবা-মা-ভাইবোন। কতবারই তো বাবাকে বলেছে, বাবা তুমি চিন্তা কোরো না। আমার পড়ালেখা শেষ হলে আমি ভাইবোনদের দায়িত্ব নেব। ওদের পড়ালেখার কোনো অসুবিধা হবে না।

এখন তো বাবার চেয়ে মাস্টারদার চেহারা বেশি ভেসে উঠছে। ছোটোখাটো মানুষটির নেতৃত্ব লৌহকঠিন। এই কঠিনকে জয় করতে হবে। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে মাতৃভূমির মুক্তির সাফল্যে। এই সাফল্যের জন্য বিপ্লবীদের কারোই পিছিয়ে থাকা চলবে না।

বাবা, তোমাকে দেওয়া কথা আমি রাখতে পারব না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও বাবা। মা, তুমিও। ট্রেনের ঝাঁকুনির সঙ্গে মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, তুই কেমন আছিস রানি? আমার হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা ভালোই চলছে। গরিব মানুষ সুস্থ হলে ওদের মুখের হাসি খুব আনন্দ দেয় রে মা।

প্রীতিলতা মাথা পেছনে হেলিয়ে দেয়। মা মাঝে মাঝে ওকে বাবার কথা বলে, যে বাবা নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কথা নিয়ে নীরবই থাকে। বলে না, মহাত্মা গান্ধী যখন বিলেতি কাপড় নিজ হাতে পুড়িয়েছিল, নিজে খদ্দরের কাপড় পরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। আর প্রীতির মায়ের জন্য এনেছিল আট হাত খদ্দরের মোটা শাড়ি। নিজের ধুতিটি ছিল হাঁটুর ওপর ওঠানো।

বাবা-মায়ের এমন কাপড়-পরা ছবি প্রীতিলতার চোখে ভাসে না। মায়ের কণ্ঠস্বরই একটি সময়ের সঙ্গে ওর কাছে বাবা-মায়ের স্মৃতি। ওর বাবার নাম জগবন্ধু, মায়ের নাম প্রতিভা।

বিধবা মায়ের ছেলে জগবন্ধু। মামার বাড়িতে সবার মন জুগিয়ে দিন কাটাত। পড়াশোনায় ছিল আগ্রহ। চেষ্টার অন্ত ছিল না। তারপরও কুলিয়ে উঠতে পারেনি। আগ্রহের সঙ্গে বুকের ভেতরের জায়গাটির ভাঙন ছিল বিশাল। মেলেনি স্বপ্ন এবং বাস্তবের এক হওয়া।

জগবন্ধুর বিয়ে হল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বর নন্দীর কন্যা প্রতিভার সঙ্গে। তাঁর ইচ্ছে ছিল মেয়ের জামাইকে বিএ পাস করিয়ে ওকালতি পড়াবেন! কিন্তু সে আশা পূরণ হল না। পারিবারিক নানা ঝামেলার মধ্যে পড়েছিল জগবন্ধু। রিপন কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দিল ঠিকই, কিন্তু পাস করতে পারল না। তারপরও চাকরির অসুবিধা হল না। প্রথমে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু হল। তারপর আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে বেশ ভালো বেতনের চাকরি পাওয়া হল। কিন্তু বনল না। ব্রিটিশ কর্মকর্তা অসম্মানজনক কটূক্তি করলে প্রবল প্রতিবাদ জানাল। ফলে চাকরি ছাড়তে হল। দেশপ্রেমের বীজ তো বুকের ভেতর রোপণ করা ছিল। তা যে-কোনো সময় মাথা তোলে। প্রীতিলতার রক্তে সেই বীজ থেকে গেছে, অন্য খাতে যায়নি। বাবা-মায়ের সবটুকুর সঙ্গেই তো তার বন্ধন।

প্রীতিলতা আবার সোজা হয়ে বসে। ট্রেনে কখনো ঘুমোতে পারে না। মনে হয়, ট্রেন ওর ছোটোবেলার খেলার সাথি। ট্রেনের কু-উ-ঝিকঝিক এক প্রবল তরঙ্গ-নদীর তরঙ্গের চেয়েও বুঝি খরস্রোতা। সেই তরঙ্গে ভেসে আসে ভগৎ সিংহের ফাঁসির খবর। বিপ্লবী ভগৎ সিং। কয়েকদিন আগে লাহোরের জেলে ফাঁসি হয় তাঁর। ব্রিটিশদের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বোমা ছুঁড়েছিলেন ভগৎ সিং। প্রীতিলতা নিজেকেই বলে, মাত্র তেইশ বছর বয়স। এই বয়সেই বিপ্লবীরা মুক্তির জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। ক্ষুদিরামের বয়স ছিল উনিশ। আর রামকৃষ্ণের—। দুহাতে মুখ ঢাকে প্রীতিলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১৯৩১। তোলপাড় হচ্ছে চারদিক। ইচ্ছে হয়, পুরো ট্রেনের সব জায়গায় লিখে রাখতে ১৯৩১। রামকৃষ্ণ নেই। প্রীতিলতা ভাবল, ১৯৩১ ওর বুকের ভেতর একটি বিশাল পাথরখন্ড। যতদিন বেঁচে থাকবে ওই পাথরখন্ডের গায়ে আঁকাআঁকি করবে প্রীতিলতা। রামকৃষ্ণের মুখ আঁকবে, গরাদের অপর পাশে বসে থাকা আঁকবে, ম্যালেরিয়ায় কাবু হয়ে শুকিয়ে থাকা মুখটি আঁকবে ভীষণ যত্ন আর মমতায়। আর কী আঁকবে? রেললাইন ধরে লাল র□্যাপার গায়ে হেঁটে যাওয়া। রামকৃষ্ণ উঠে আসবে গৌরবে—প্রবল ভালোবাসায়।

প্রীতিলতা দু-হাতে চোখের জল মোছে।

পরক্ষণে ভাবে, লাহোর জেলে বন্দি থাকা ভগৎ সিংকে কি জেলখানায় চল্লিশবার দেখতে গিয়েছিল কেউ? অন্য কোনো প্রীতিলতা? কিংবা কোনো পিসিমা? নাকি ওর দিনগুলো শুধু ওর একারই ছিল? হায় ভগৎ সিং, তুমি আমার প্রণতি নাও।

প্রীতিলতা চোখ বোজে। ও বুঝতে পারে, এখন ওর ঘুম পাচ্ছে। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ও গভীর স্বপ্নে ডুবে যেতে চায়। ওর স্বপ্নের মধ্যে বাবা-মায়ের সংসার ছবির মতো ফুটে ওঠে। যতদিন প্রীতির মায়ের বড়োলোক দাদামহাশয় আর বাবা বেঁচেছিলেন, ততদিন তার মায়ের সংসার চালাতে কষ্ট হয়নি। তারা খুব সাহায্য করত। কিন্তু এরপরে দরিদ্র স্বামীর পরিবারে মায়ের খুব কষ্ট হয়েছে। তারপরও সংসারকে দু-হাতে সামলিয়েছে। নয় বছর বয়সে যার বিয়ে হয়, তার কি সংসার সামলানো শিখতে সময় লাগে? প্রতিভারানি খেলার মাঠ, স্কুল কিছুই দেখেনি, শুধু চিনেছে হেঁসেল। সেই হেঁসেল তখনো জ্বলছে। বেশ জ্বলছে। প্রতিভা সবাইকে ভাত খেতে দিয়েছে। কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। হাতে কাচের চুড়ি আর শাঁখা। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে গো, তোমার হাজার বছর আয়ু হোক।

প্রীতিলতার ঘুম ছুটে যায়।

চমকে উঠে চারদিকে তাকায়। আত্মীয়-স্বজন মেয়ের এত লেখাপড়ার দরকার কী বলে, বাবা মাকে গালমন্দ করে। এত বিদ্যাধরী হয়ে কী হবে, সেই তো চুলো ঠেলতে হবে! এই মেয়েকে দিয়ে যেন নাকানি চোবানি খেতে না হয়! মান-সম্মান রাখবে তো?

‘একটি মেয়ে বড়ো হতে চায়। হতে দেবে না কেন? যতদূর পড়ালেখা করতে পারে, করুক না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তোমাদের গায়ে বাধছে কেন?'

প্রতিভার মুখ ঝামটায় কেউ কেউ থেমে যায়। অনেকেই আড়ালে গুষ্টি উদ্ধার করে। জগবন্ধু ভাবে, যে যা বলে বলুক। মেয়ে তো আমার বুঝদার। আমাকে বলে, বাবা তুমি ভেব না। ভাইবোনদের লেখাপড়ার সব দায়িত্ব আমি নেব। বিএ পাস করেই চাকরিতে ঢুকব।

জগবন্ধু অন্যদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'এমন মেয়ে ঘরে ঘরে জন্মায় না।'

প্রীতিলতা সোজা হয়ে বসে। দু-হাতে নিজের চুল সামলায়। মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা চুল কানের পাশে গুঁজে দেয়। দেখতে পায় রেলগাড়ি গোয়ালন্দ ঘাটে এসে থেমেছে। ও জানালা খুলে মাথা বের করে। নদীর ওপর থেকে ভেসে আসছে স্নিগ্ধ বাতাস। নদী পার হয়ে চাঁদপুর পৌঁছলে ছটফটিয়ে ওঠে প্রীতিলতা। বাবা-মা ভাইবোন সবার জন্য মন কেমন করে। চোখে জল আসে। চোখ মুছে সামনে তাকালে প্রিয় দেশের ছবিটি ভেসে ওঠে—বুকের ভেতর গুনগুনিয়ে ওঠে ক্ষুদিরামের কণ্ঠস্বর—একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

সবাইকে চমকে দিয়ে বাড়িতে পৌঁছলে মা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকায়, 'কীরে চেহারা অমন হয়েছে কেন? পরীক্ষার জন্য খুব খেটেছিস বুঝি?'

বাবা বলে, 'ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করিসনি বুঝি? যে টাকা পাঠিয়েছি তা দিয়ে চলতে খুব কষ্ট হয়েছে মা? পারলে তোকে আমি আরও বেশি টাকা দিতাম। তুই আমার সোনার টুকরো মেয়ে।'

বাবার আদরের ডাকে ওর চোখে জল আসে। ভেজা কণ্ঠে বলে, 'না বাবা, আমি তো খুব ভালো ছিলাম। তোমরা অনেকদিন পর দেখছ তো তাই অমন লাগছে।'

পাশ থেকে শান্তি বলে, 'আদরের মেয়ে একদিন কাছে না থাকলেই বাবা-মায়ের কাছে তা অনেক দিন হয়ে যায়। দিদি ভাগ্যবতী! আমরা দিদির মতো ভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি।'

'এমন কথা বলবি না শান্তি। বাবা-মা সবাইকে সমান ভালোবাসে।'

'জানি, জানি। তারপরও বাবা-মার ভালোবাসার হেরফের হয়।'

প্রতিভা শান্তিকে বলে, 'চুপ কর শান্তি। মেয়েটি মাত্র বাড়িতে এল। এখন এসব কথার দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নেই।'

মায়ের দিকে তাকিয়ে বাবা-মাকে পাশ কাটিয়ে প্রীতিলতা নিজের ঘরে এসে ঢোকে। পিছে পিছে আসে ছোটো দুই বোন। বলে, 'দিদি বলছ ভালো ছিলে, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তোমার কেউ মারা গেছে।'

চমকে ওঠে প্রীতিলতা।

'কী বললি? বাজে কথা বলিস না।'

'তাহলে চেহারা অমন হয়েছে কেন? আগেও তো কলকাতা থেকে এসেছ। এমন তো দেখায়নি তোমাকে।'

'তোরা এখন যা। আমাকে একটু ঘুমোতে দে। খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'তুমি আগে যখন বাড়িতে এসেছ, তখন একটুও ক্লান্ত হওনি। উলটো আমাদের সঙ্গে হইচই করেছ। পাড়ার লোকের কথা জিজ্ঞেস করেছ। গান গেয়েছ। এবার দেখছি তুমি আমাদের আগের দিদি নেই।'

'তোরা না থামলে আমি খুব রাগ করব।'

দু-বোন ঘর ছেড়ে চলে গেলে প্রীতিলতা বালিশে মুখ গোঁজে। অঝোরে বেরিয়ে আসা চোখের জল বালিশ ভিজিয়ে দেয়। দ্রুত নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। মা-বাবা-বোনেরা এসে ওকে কাঁদতে দেখলে চেহারা খারাপ হয়ে যাওয়ার অনুমানটি সত্যি হয়ে যাবে। ও বালিশে চোখ মুছে কাত হয়ে শুয়ে চোখ বোজে। কিন্তু স্বস্তি পায় না। বুঝতে পারে অস্থিরতা ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মাথার ভেতর ঢং ঢং ধ্বনি। ঘুম বা ক্লান্তি দূর করা এসব কিছুর মধ্যে হবে না। চোখ খুলে ছাদের দিকে তাকায়। কাত থেকে চিৎ হয়। বুকের ওপর দু-হাত জড়ো করে রেখে বলে, 'ভগবান আমাকে শক্তি দাও। যে-পথে নেমেছি সে-পথে আলোর ফুল ফোটাতে চাই ভগবান। আমি কিছুতেই পিছু হটে আসব না।'

তখন খানিকটুকু স্বস্তি পায় ও। রামকৃষ্ণ ওকে বলেছিল, অপূর্বর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বলেছে, 'অপূর্ব দারুণ ভালো ছেলে। ও মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দেখবে, তোমার কাজের গতি বেড়ে যাবে। আমাদের অনেক কিছু করার আছে প্রীতি।'

'তুমি ভেব না। আমি অনেক কিছুই করব। দেশমাতৃকার মুক্তির চেয়ে আমার জীবনের মূল্য বেশি নয়।'

সেদিন রামকৃষ্ণের গরাদের ফাঁকে ওর হাত চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'লং লিভ রিভলিউশন।'

প্রীতিলতার অস্থির লাগে। ও শুয়ে থাকতে পারে না। চৌকির ওপর উঠে বসে। দু-বোন বাইরে যাবার সময় দরজার পাল্লা টেনে গেছে। জানালা খোলা। ওই পথে বাতাস এবং আলো ঢুকছে ঘরে। দিনের আলো যত বাড়ছে পাখির ডাক তত কমে যাচ্ছে, আর ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ও চৌকি থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়ায়। যতদূর চোখ যায় কেবল সবুজের বিস্তার। এদিকে কোনো বাড়ি নেই, তাই দৃষ্টি কোথাও আটকায় না। সুন্দর তার সবটুকু নিয়ে নিজের প্রকাশ ঘটায়। প্রীতিলতা জানালার শিকে কপাল ঠেকায়। বড়ো করে শ্বাস নিলে কাঠালচাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। এ বাড়ির সামনের দিকে ছোটো একটি ফুলের বাগান আছে। ও নিজে অনেকগুলো গোলাপের চারা লাগিয়েছে। আরো আছে নানারকম জবা। আছে কাঠালচাঁপার ঝড়। পূর্ণিমার রাতে মাদুর বিছিয়ে বসে সবাই। কীর্তন গাওয়া হয়। গান গাইতে গাইতে সবাই পূর্ণিমার চাঁদের আকাশে পাড়ি দেখে। বেলি ফুলের সুবাস বয়ে নিয়ে আসে বাতাস। প্রীতিলতা ভাবল, এমন সন্ধ্যা বিপ্লবী কর্মকান্ডের বিপরীত সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যা উপভোগের জন্য স্বাধীন স্বদেশ প্রয়োজন। এই স্বস্তিই তো মানুষের শেষ আশ্রয়।

প্রীতিলতা দ্রুতপায়ে এসে দরজা খোলে। দেখতে পায় ছোটো দু-বোন দরজার কাছে বসে আছে। ওকে দেখে লাফিয়ে ওঠে, 'দিদি উঠেছ? ভালো ঘুম হয়েছ তো?'

প্রীতিলতা দুজনের ঘাড়ে হাত রেখে বুকে জড়িয়ে ধরে। শান্তি হাসতে হাসতে বলে, 'দিদির মন ভালো হয়েছে।'

'হ্যাঁ, মন ভালো হয়েছে। চল সবাই মিলে ঝর্নার ধারে গিয়ে চান করে আসি।'

'ঝর্নায় চান করবে? জোঁকের কথা ভুলে গেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘ভুলিনি রে। আগে যেমন নুন নিয়ে ঝর্নার জলে পা ডুবিয়ে বসতাম, এখনো তাই করব। জোঁকে ধরলেই নুন ছিটিয়ে দেব। ওগুলো জলের ওপর চিৎপটাং হবে। তারপর তলিয়ে যাবে।’

হেসে গড়িয়ে পড়ে দুই বোন। তারপর ছুটে যায় গামছা আনার জন্য। প্রীতিলতা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, ‘মা আমরা ঝর্নার জলে চান করতে যাচ্ছি। দেরি হলে ডাকাডাকি কোরো না। আমরা ঠিক সময়ে ফিরে আসব।’

প্রতিভা বুঝতে পারে মেয়ের কণ্ঠে সুর নেই। ভাঙা স্বরে কথা বলছে। মেয়েটার কিছু একটা হয়েছে। প্রতিভা ওর কথায় ঘাড় কাত করে। মুখে কিছু বলে না।

রাতে খাবার সময় মা আবার আগের প্রশ্ন ওঠায়, ‘শরীরটা যে এত খারাপ হয়েছে, নিজে বুঝি টের পাসনি? চোখ দুটো এমন বসে গেছে কেন? খুলে বল তো তোর কী হয়েছে?’

‘এসব নিয়ে ভাবার কি সময় আছে মা? পরীক্ষা দিলাম না? পড়ালেখার চাপের কথা তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন?’

‘সে তো বুঝলাম। এখন তো পরীক্ষা নেই। তুই এত চুপচাপই বা কেন? তুই এবার এত চুপচাপ কেন রে?’

‘আচ্ছা দিদি, প্রত্যেকবার তো কলেজের খবর-টবর বলো, কত হাসিখুশি গল্প করো। এবার যে কিছু বলছ না?’

প্রীতিলতার অসহিষ্ণু কণ্ঠ—‘পরীক্ষা নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলাম। বারবার এত প্রশ্ন করবি না শান্তি। আমার কথা বলতে মোটেই ভালো লাগছে না।’

বাবা-মা, ভাই-বোন চমকে ওর মুখের দিকে তাকায়। ভেবে পায় না যে, মেয়েটা এমন বদলে গেল কেন। ওর সংক্ষিপ্ত জবাবটুকুও বেমানান। ও কখনো এত অল্প জবাব দেয় না। একটা কথা বলতে গিয়ে দশটা কথা বলে। ভাত প্রীতিলতার গলায় আটকে যায়। প্রচণ্ড খিদে, তবু খেতে ভালো লাগে না। কতদিন পর মার হাতের রান্না, সেটাও বিস্বাদ লাগছে।

‘কি রে কিছুই তো খাচ্ছিস না?’

মার কণ্ঠে উদ্বেগ। বাবা কোমল চোখে তাকিয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা বিব্রত বোধ করে। বলে, 'খেতে ভালো লাগছে না মা।'

'অল্প যা পারিস খা। অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিস তো, তাই খারাপ লাগছে।'

বাবার স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে প্রীতিলতার চোখে জল আসতে চায়। অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে গভীর মনোযোগে কই মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলে, 'কলকাতায় কোনোদিন এত বড়ো কই মাছ খাইনি। দো-পেঁয়াজাও চমৎকার হয়েছে মা।'

প্রতিভা উৎসাহ নিয়ে বলে, 'কাল সকালে তোর জন্য ভাঁপা পিঠে বানাব। চালের গুঁড়ি করাই আছে।'

'ভালো হবে। পিঠে খেয়েই বেরুব। নন্দনকাননে মেয়েদের যে স্কুল হয়েছে, ওখানে একটা চাকরির কথা হয়েছে আমার।'

'এই তো পরীক্ষা দিয়ে এলি। আবার চাকরি?'

'হ্যাঁ, বাবা। চাকরিটা হয়ে গেলে যোগদান করাই ভালো। বসে থেকে কী হবে? শিক্ষকতার চাকরিতে পড়ালেখার চর্চা থাকে, আবার আর্থিক স্বচ্ছলতাও হবে। আমার বেতনের টাকা মায়ের হাতে তুলে দেব।'

'বুঝেশুনে বের হোস। শহরের অবস্থা ভালো না। পুলিশ তাণ্ডব চালাচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে যুবক ছেলেদের। ছেলেরা কেউ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে, কেউ পলাতক। এদের বিচার চলছে জেলের মধ্যে, করা হচ্ছে নির্যাতন। মাগো, আমি ভাবতে পারি না। ঘরে ঘরে আতঙ্ক, ভয়, কান্না—'

প্রীতিলতা মাথা সোজা করে বলে, 'শুধু ভয়—কান্না? বিদ্রোহ নেই?'

ওর বাবা হ্যাঁ-না কিছু না বলে উঠে চলে যায়। তার খাওয়া শেষ। বাবার চলে যাওয়া দেখে প্রীতিলতা দ্বিধান্বিত হয়। বাবার কি চাকরি করার সায় নেই? ওতো সংসারের স্বচ্ছলতার কথা ভাবছে? তবে? ও মায়ের দিকে মুখ ঘোরায়। দেখতে পায় মা একদৃষ্টে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কেউ কিছু বলার আগেই ছোটো দু-বোন হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, 'বাবা এবার তোমাকে বিয়ে দেবে দিদি। চাকরির চিন্তা ছেড়ে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

একই সঙ্গে প্রতিভাও বলে, 'হ্যাঁ মা, তোর বাবা তোর জন্য ছেলে দেখছে।'

'দেখো মা, তোমরা সব সময় এমন করো। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর একবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে, আইএ পরীক্ষা দেওয়ার পরও তাই করলে। এখন আবার শুরু করেছ। আমি এখন বিয়ে করব না।'

'তোর ছোটো বোন দুটোও বড়ো হয়ে গেছে। ওদের জন্য তো পাত্র দেখতে হবে।'

'যদি মনে করো যে, ছোটোরা বড়ো হয়ে গেছে তাহলে তুমি ওদের আগে বিয়ে দিয়ে দাও মা।'

'পাগল, তা কি হয়? বড়ো মেয়েকে রেখে ছোটোদের কেন বিয়ে দেব? মেয়ে কি আমার কানা না নুলা?'

মার কথায় ছোটো দু-বোন হি হি করে হাসে। প্রীতিলতার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ও পালিয়ে বাঁচে। বাবা-মায়ের উপর রাগ করতে পারে না। জানে, সমাজটা এমনই। বেশির ভাগ তো বাল্যবিয়েই হয়, ও তো তবু বিএ পর্যন্ত পড়তে পেরেছে।

প্রীতিলতা অপূর্বর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। খবর পায়, ও কর্ণফুলির ওপারে আছে। ফিরলে যোগাযোগের ব্যবস্থা হবে। মা ওকে সাবধান করেছে। বলেছে, বিপ্লবীরা সবাই পলাতক। এখন শান্ত হয়ে বাসায় থাকতে হবে। পুলিশ শহরে তাণ্ডব চালাচ্ছে। খানা-তল্লাশির নামে বাড়িঘর তছনছ করছে। মেয়েদেরকে অপমান করছে। প্রীতিলতা চুপচাপ মায়ের কথা শুনেছে। আর গোপনে গোপনে খোঁজ করেছে অপূর্বর। ওর ডাক নাম ভোলা।

একদিন দেখা হল অপূর্বর সঙ্গে। শহরের একজন আশ্রয়দানকারীর বাড়িতে। সংক্ষিপ্ত আলাপ। প্রীতিলতা সরাসরি বলল, 'আমি ডিরেক্ট অ্যাকশনে যেতে চাই। সেজন্য আমার মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

অপূর্ব ঘাড় নেড়ে বলে, 'আমি আপনার কথা মাস্টারদাকে বলব। তিনি কী বলেন, জেনে আপনাকে জানাব।'

'কবে জানাবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘সে তো আমি বলতে পারব না। তাঁর সঙ্গে যেদিন কথা হবে, সেদিনই জানাতে পারি, নইলে পরদিন।’

কয়েকদিন পরে অপূর্ব যোগাযোগ করে। প্রীতিলতা তখন নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্কুল থেকে বের হওয়ার সময় দেখল, অপূর্ব দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের গেটের সামনে। ওকে দেখে দূরে সরে যায়। তারপর পিছু নেয়। বাড়ির কাছাকাছি এসে দ্রুতপায়ে সামনে এসে বলে, ‘মাস্টারদা বলে দিয়েছেন, এখন দেখা করতে পারবেন না। কিছুদিন পরে তিনি জানাবেন যে কবে দেখা হবে।’

এটুকু বলেই অপূর্ব সরে পড়ে। মুহূর্তে আড়াল হয়ে যায় বড়ো গাছের মোড়ে। প্রীতিলতা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। স্কুলের কাগজপত্র নিয়ে এসেছে বাড়িতে বসে দেখার জন্য। সেগুলো বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, যেন এখনই বইখাতা নিয়ে স্কুলের পড়া শিখতে বসতে হবে। ওর খুব মন খারাপ হয়। প্রীতিলতা হতাশাও বোধ করে। ও চট্টগ্রামে আসার পর কল্পনা দত্তও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে চায়। অপূর্ব আরো বলেছে, ‘দিদি সাবধানে থাকবেন। অস্ত্রাগার দখলের পর থেকেই পুলিশ ও মিলিটারি খুব তৎপর। আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের ধরার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। মাস্টারদাকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্য পুলিশ পুরস্কারের টাকা পাঁচ হাজার থেকে বাড়িয়ে সাড়ে সাত হাজার করেছে। পুলিশ গ্রামে গ্রামে সন্দেহভাজন ছাত্র ও তরুণদের ওপর নানারকম নির্যাতন করছে। তাদের অভিভাবকদেরও নানারকম জুলুম ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাই আত্মগোপনরত নেতা ও কর্মীদের খুব গোপনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হচ্ছে।’

প্রীতিলতা চুপচাপ অপূর্বর কথা শুনে যায়। অপূর্ব একসময় ফিসফিসিয়ে বলে, ‘রামকৃষ্ণদার সঙ্গে আপনি যে জেলে দেখা করেছেন, তা সবাই জানে। রামকৃষ্ণদার সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে, তা শোনার জন্য মাস্টারদা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। যে কোনো সময় মাস্টরদা আপনাকে খবর পাঠাতে পারেন।’

অপূর্ব চলে গেলে প্রীতিলতা একা একা বাগানে আসে। আসামলতার ঝোপের দিকে তাকালে মনে হয়, কারাগারের লোহার শিক যেন গায়ে গায়ে লেগে আছে। পাতাগুলো রামকৃষ্ণর চোখ। ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রীতিলতা পরক্ষণে নিজেকে শাসন করে। কলকাতা থেকেই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ও নিজেকে শাসন করে এসেছে। রামকৃষ্ণের কথা মনে করে ও আর মন খারাপ করবে না। এখন কাজের সময়। তপস্যায় নিমগ্ন থাকার সময়। ও আর পিছু ফিরে তাকাবে না। তাই মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় ওর প্রহরগুলো উন্মুখ হয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১৫

একদিন প্রতীক্ষার শেষ হয়।

অপূর্ব এসে প্রীতিলতাকে নিয়ে যায় মাস্টারদা আর নির্মল সেনের সঙ্গে দেখা করানোর জন্য। কয়েকবারই দেখা হয়। মাস্টারদা ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছেন। সে দায়িত্ব প্রীতিলতাকে দেবেন, তাও তার মাথায় আছে। দুজনই পলাতক জীবনযাপন করছে। বর্তমানে ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে থাকে। চট্টগ্রামে এলে অপূর্ব এসে প্রীতিলতাকে দেখা করার খবর দেয়।

একদিন প্রীতিলতা শান্তিকে বলে, 'মাস্টারদা আর নির্মলদার সঙ্গে দেখা করতে ধলঘাটে যাব। আমি ভাবছি তুই বড়ো হয়েছিস। এখন থেকে তোকে এসব কাজ শিখতে হবে।'

'সত্যি!'—শান্তি চেঁচিয়ে ওঠে। 'মাস্টারদাকে দেখার আমার কতদিনের স্বপ্ন। আমি তো ভাগ্যবতীরে দিদি। আমার দেবতা দর্শন হবে।'

প্রীতিলতা বলে, 'চুপচাপ থাক। বেশি হইচই করিস না।'

একদিন যাওয়ার তারিখ ঠিক হয়। ট্রেনে যেতে হবে। প্রীতিলতা বলে, 'ছেলেদের পোশাকে যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে যাব। অনেকটা মুসলমান মেয়ে সেজে যাব।'

হি-হি করে হাসে শান্তি। হেসে গড়িয়ে পড়ে। প্রীতিলতা বিরক্ত হয়ে বলে, 'এত হাসির কী হল?'

শান্তি আকস্মিকভাবে চুপ করে যায়।

প্রীতিলতা রাগত স্বরে বলে, 'হাসিটা তোর অসুখের মতো হয়েছে। এত যে হাসতে পারিস, মাগো মা! হ্যাঁরে শান্তি, আমি মারা গেলে তখনো কি তুই হাসবি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

শান্তি ছলোছলো চোখে বলে, 'দিদি এমন কঠিন কথা বোলো না। তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কেন?'

'নিষ্ঠুর? কেন কী জানি! সত্যি কি আমাকে নিষ্ঠুরতা পেয়ে বসেছে? তোর তাই মনে হচ্ছে শান্তি?'

'আমি জানি না, আমি জানি না।'

শান্তি দু-হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'আমার হাসি দেখেছ। এবার কান্না দেখো।'

প্রীতিলতা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণে নিজের মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'বুঝেছি। তৈরি হয়ে নে। একটু পরে আমাদের স্টেশনে যেতে হবে।'

'ক-দিন থাকবে ধলঘাটে?'

'দু-দিন। ফিরে এলে অনেক কাজ আছে।'

'বিপ্লবের কাজ?'

'হ্যাঁ, সেটাও। আবার স্কুলের কাজও।'

দু-বোনে যাবার জন্য তৈরি হয়। প্রতিভা গম্ভীর হয়ে বলে, 'যেতেই হবে?'

'মাগো, যেতেই হবে। মাস্টারদা যাবার জন্য খবর পাঠিয়েছেন। সাবিত্রী মাসির বাড়িতে মাস্টারদা, নির্মলদা আর অপূর্ব আছে।'

'বুঝেছি। ঠিকঠাক মতো ফিরে আসিস। তোদের বাবা বাড়ি ফিরে মন খারাপ করবে।'

'বোঝানোর জন্য তুমি তো আছ মা। তুমি আমাদের বড়ো ভরসা।'

'আচ্ছা যা, ঠিকঠাক মতো ফিরে আসিস। শহরে কেউ এলে খবর পাঠাস।'

মাকে প্রণাম করে দুই বোন বেরিয়ে যায়। স্টেশনে গিয়ে দেখা হয় অজয়ের সঙ্গে। অজয় ধলঘাট পর্যন্ত ওদের সঙ্গে যাবে। আবার ওদের সঙ্গে ফিরে আসবে। রেলের কামরায় বসে হাসি পায় শান্তির। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলায়। মাথার ঘোমটা টানতে টানতে পুরো মুখ ঢেকে ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পাশে বসে থাকা ওর বয়সী একটি মেয়ে বলে, 'তোমার কি ভয় করছে?'

'ভয়? ভয় করবে কেন?'

'তোমার শরীর কাঁপছে।'

'ট্রেনের দুলুনিতে আমার এমন হয়।'

'ও আচ্ছা, তো এতবড়ো ঘোমটা দিয়েছ কেন?'

'আমি এমনই ঘোমটা দেই।'

'বাড়িতেও এমন ঘোমটা দাও?'

'দরকার হলে দেই। বড়োদের সামনে পড়লে ঘোমটাতো দিতেই হয়।'

'ও বুঝেছি, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় তোমার শ্বশুরবাড়ি?'

'ধলঘাটে।'

'আমরাও ধলঘাটে নামব। ভালোই হল তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে।'

শান্তি আর কথা বাড়ায় না। পাশে বসে থাকা প্রীতিলতা ওকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়েছে। ও বুঝেছে যে, দিদি ওকে কথা বলতে নিষেধ করেছে। ও একদম চুপ হয়ে যায়। মনপ্রাণ দিয়ে রেলগাড়ির শব্দ শোনে। কু-উ-ঝিকঝিক—কত যে ছন্দ, কত যে গান। মনে হয় রেলগাড়ি ওদের বাড়িতে কীর্তন গাইছে। সবাই মিলে শুনছে সে গান। শুনতে শুনতে ওদের দু-বোনের মন জুড়িয়ে যায়।

প্রীতিলতা জানে শব্দ ওর কাছে বিপ্লবের ডাক। রেলে চড়ে কলকাতায় শুধু পড়তে যায়নি। সঙ্গে নিয়ে গেছে দেশমুক্তির বাণী, ফেরার সময় সঙ্গে এনেছে বোমার খোল। এনেছে প্রতিজ্ঞা। ডু

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

অর ডাই-এর চেতনা। এই গাড়ি ওকে দেশ দেখার সাধ মিটিয়েছে। গাড়ির ছুটে চলায় স্বদেশের অনেকখানি দেখেই তো আপন মাটির চিন্তা ওকে বেশি করে ভাবিয়েছে। নিজের দেশ নিজের নয়, শাসন করছে বাইরের কেউ, নিজ বাড়িতে ওরা পরাধীন বাসিন্দা, এর চেয়ে অপমানের আর কী হতে পারে? এর চেয়ে অমর্যাদার আর কী হতে পারে? প্রীতিলতা রেলের শব্দকে বুকের ভেতর নিয়ে প্রতিজ্ঞাকে কঠিন রাখে। পিছু না-হটার দৃঢ়তায় ওর দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হয়। ও বুঝতে পারে রেলের শব্দের সঙ্গে এই শব্দও সমান্তরাল।

ধলঘাটের রেলস্টেশনে নেমে অজয় একটি বটগাছের নীচে দাঁড়াল। সঙ্গে দুই বোন। অল্পক্ষণেই তিনজনে দেখল উত্তর দিক থেকে একজন আসছে। বেশ লম্বা, হালকা-পাতলা গড়ন এবং কালো রঙের ছেলেটি কাছে এসে দাঁড়াল। ওর দিকে তাকিয়ে অজয় বলল, 'ও আপনাদেরকে নিয়ে যাবে। আপনারা একসঙ্গে হাঁটবেন না। আগে-পিছে করে হাঁটবেন। ওর নাম সুবল।'

ছেলেটি কাছে এসেই বলল, 'আসুন।' তারপর দ্রুতপায়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। মাঝখানে প্রীতিলতা ও শান্তি। বেশ পেছনে অজয়। যেন ওরা সবাই ভিন্ন পথের যাত্রী। এক-একজনের গন্তব্য এক-একদিকে। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। মাঝে মাঝে সুবল এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। পুরো সন্ধ্যা নামেনি। চারদিকে তাকিয়ে দিনের শেষ বেলায় নেমে আসা আলোয় স্নাত গ্রামের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয় প্রীতিলতা। বিড়বিড় করে বলে, 'তুমি আমারই ফুল-পাখি লতাপাতা মাটি ফসল।'

ঠিক সন্ধ্যায় ওরা পৌঁছে যায় সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে। মাটি দিয়ে বানানো ঘর। খড়ের চাল। গাছপালায় ছাওয়া বাড়িটি অন্ধকার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু টিমটিম করে জ্বলছে কুপি। প্রীতিলতা আবারও নিজেকে বলে, 'আহ, এটা আমারই আলো। ওই মাটির পিদিম আমার সম্পদ। আমি ওকে আলোর ফানুস বানাব।'

মাস্টারদা ওদের দেখেই বলে, 'কেমন আছ ফুলতার?'

প্রীতিলতা 'ভালো' বলেই মাস্টারদাকে প্রণাম করে। ও উঠতেই শান্তিও প্রণাম করে। সাবিত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দেবী এগিয়ে এসে প্রীতিলতাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কেমন আছিস ফুলতার? আয়, ভেতরে আয়।'

সবাই মিলে ঘরের দিকে যায়। মই বেয়ে দোতলায় উঠতে হয়। সবাই মিলে আপাতত নীচের ঘরেই বসে। শান্তি বিস্ময়ে মাস্টারদাকে দেখে। ওর মাথায় হাত রাখার পর থেকে ও ভাবছে হাতটা বুঝি ওখানেই আছে। মাস্টারদার হাতের স্পর্শ ওকে ভীষণ নাড়া দেয়। যার নাম এতদিন ধরে শুনে এসেছে, কিন্তু সামনাসামনি দেখা হয়নি, আজ দেখতে পেয়ে ওর তো অন্যরকম লাগবেই। শান্তি নিজেকে সংযত করে। কতদিন তো মনে হয়েছে তিনি খুব আপন লোক। কেন তাকে আপন মনে হয়। রহস্য কী? দিদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। দিদি ওকে সহজ করে বুঝিয়ে দেবে। শান্তির সবার দিকে তাকিয়ে স্বস্তিবোধ করে।

মাস্টারদার দিকে তাকিয়ে প্রীতিলতা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'আমি এবার ডিরেক্ট অ্যাকশনে যেতে চাই দাদা।'

'আমি তোমার ইচ্ছার কথা শুনেছি। নানাজনের মাধ্যমে আমার কাছে খবর পৌঁছেছে ফুলতার। তার আগে তোমার অস্ত্র শেখার ট্রেনিং দরকার।'

'ট্রেনিংয়ের জন্য আমি প্রস্তুত। যখনই বলবেন, তখনই যাব।'

'আজ আমরা এই পরিকল্পনা ফাইনাল করব।'

অপূর্ব দাঁড়িয়ে বলে, 'আমিও ট্রেনিং নেব। ফুলতার দিদির সঙ্গে আমিও ডিরেক্ট অ্যাকশনে যাব।'

'সে দেখা যাবে। এখন বোস।'

অপূর্ব বসে পড়ে।

সাবিত্রী দেবী হাসতে হাসতে বলে, 'ভোলা আছে বলেই আমার এই আশ্রয়কেন্দ্র প্রাণ পায়। ও একটা মজার ছেলে।'

নির্মল সেন অপূর্বর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'ও আমাদের সাহসী বিপ্লবী। ট্রেনিংয়ের জন্য পাগল হয়ে আছে। হ্যাঁ রে ভোলা, ঘোড়ায় চড়তে পারবি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘পারব না কেন? এটা এমন কি কঠিন কাজ?’

‘তাহলে তোর কাছে কঠিন কাজ কী? বোমা ছোঁড়া?’

‘মোটেই না, সেটাও আমি অনায়াসে পারব।’

‘বাহ্, গুড বয়।’

প্রদীপের মৃদু আলোয় ওর মুখ ঠিকমতো দেখা যায় না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চলাফেরার জন্য টর্চের আলো দু-হাতে চেপে ধরে এরা বাইরের কাজকর্ম সারে। বিপ্লবীরা এই বাড়িতে পলাতক জীবন কাটাচ্ছে বলে সন্তর্পণভাবে সবকিছু করতে হয়। এই বাড়িতে দুটি ছেলেমেয়েও আছে। ওরাও অনেক বুঝেসুঝে চলে। অপূর্বর সঙ্গে গলা উঁচু করেও কথা বলে না কেউ। ওকে প্রশংসা করে নির্মল সেন শান্তির দিকে তাকায়।

‘আমাদের শান্তি কি বিপ্লবের কাজে যুক্ত হতে পারবে?’

‘পারব, দাদা পারব।’ ও গলা উঁচু করতে গিয়ে আবার নিজেকে সংযত করে বলে, ‘আজ আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। মাস্টারদাকে দেখার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল। আজ তাঁকে দেখে আমার প্রাণে আগুনের পরশমণি লেগেছে।’

‘বাব্বা, এরা সব বিপ্লবী হয়ে উঠেছে। আমাদের আর ভয় নেই। দেশমাতার মুক্তি হয়েই গেছে বলা যায়।’

মাস্টারদা মৃদুস্বরে বলে, ‘তুমি কী ভাবছ ফুলতার?’

‘আমি তো আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। দিন-তারিখ ঠিক করলেই অপারেশনে যাব।’

‘অপূর্ব সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিদির সঙ্গে আমিও যাব।’

প্রীতিলতা ওর দিকে তাকিয়ে বলে, ‘হ্যাঁ, তুমিও। আমরা একসঙ্গে ট্রেনিং করব।’

নির্মল সেন গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, ট্রেনিং কাউলিতে হবে রানি।

‘যেখানেই হোক আমার আপত্তি নেই। তবে আমার ছদ্মনাম ফুলতার। পলাতক সময়ে এই নামেই সবাই আমাকে ডাকবে।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নির্মল সেন রূঢ় গলায় বলে, ‘বেশি কথা বলবে না তুমি। যে নামে খুশি, আমি সে নামেই ডাকব।’

এক মুহূর্ত চুপ থাকে সবাই। সাবিত্রী দেবী বলে, ‘খাবার দেই? আপনারা রাতের খাবার খেয়ে নিন।’

মাস্টারদা ঘাড় নেড়ে বলেন, ‘দিন দিদি। কী রান্না করেছেন?’

‘কলাইয়ের ডাল আর পোস্ত চচ্চড়ি।’

নির্মল সেন শান্তিকে বলেন, ‘কি রে শান্তি পারবি খেতে? মোটা লাল চালের ভাত দিয়ে ডাল আর পোস্ত চচ্চড়ি।’

‘খুব পারব খেতে। এটা কোনো কঠিন কাজই না।’

‘বিপ্লবের পথ কঠিন। অনেক কষ্ট। কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে। পারবি সহ্য করতে?’

‘আপনাদের আশীর্বাদ আর শিক্ষা পেলে কোনো কষ্টই কষ্ট থাকবে না।’

‘নাহ্, মেয়েটাকে কোনোভাবেই দমানো গেল না। ও রানির মতোই শক্ত।’

এবারও কেউ কথা বলে না। নির্মল সেন টর্চটা নিয়ে দোতলায় চলে যায়।

সাবিত্রী দেবী মাদুর বিছিয়ে খাবার আয়োজন করে। গামলাভর্তি লাল চালের ভাত থেকে এক ধরনের সুগন্ধি আসে। শান্তি বুঝে যায় যে, এ অন্যরকম চাল। সবাই সানকি নিয়ে বসে পড়ে।

সাবিত্রী দেবী অপূর্বকে বলে, ‘ভোলা উপর থেকে নির্মলকে ডেকে নিয়ে আয়।’

অপূর্ব উপরে গিয়ে ফিরে এসে বলে, ‘দাদা বলেছে খাবে না।’

মাস্টারদা ভুরু উঁচিয়ে বলে, ‘খাবে না কেন? সেই দুপুরের পরে আর কিছু খাওয়া হয়নি। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। ফুলতার তুমি গিয়ে ডাক।’

প্রীতিলতা ওঠার আগেই নির্মল সেন নেমে আসে। বলে, ‘শরীর কেমন করছে, তাই আমি খেতে চাচ্ছিলাম না।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘দু-মুঠো খাও। নাও বেশি দেইনি।’

নির্মল সানকি টেনে নেয়। জানে এটা আশ্রয়দাত্রীর হুকুম। খেতেই হবে। গবগবিয়ে দু-গ্রাস মুখে পুরে কোঁত করে গিলে ফেলে একগ্লাস জল খায়।

মাস্টারদা কড়া চোখে তাকিয়ে বলে, ‘ঠিকমতো খাচ্ছ না তুমি?’

নির্মল সেন আবার একগ্লাস জল খায়। কোনোদিকে না তাকিয়ে সানকির ভাত শেষ করে। তারপর শান্তির দিকে তাকিয়ে বলে, ‘লজ্জা করে কম খাবি না শান্তি। আজ কিন্তু তোমরা এই গরিব দাদার অতিথি।’

শান্তিরও নিজের খাওয়া শেষ হয়েছে। সানকিতে জল ঢেলে বলে, ‘আপনি বারবার আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন দাদা। আমি বলেছি না আপনাদের আশীর্বাদ আর শিক্ষা পেলে আমি সব করতে পারব।’

‘আশীর্বাদ করবেন আমাদের চেয়ে যিনি শক্তিমান—সেই ভগবান। মনের জোর চাই, সৎপথে থাকার চিন্তা চাই—তবেই ভগবানের আশীর্বাদ লাভ হবে। আর তোকে শিক্ষা দেবে রানি। সাহসী, তেজী, গুণী মেয়ে। ওর চেয়ে ভালো শিক্ষা তোকে আর কেউ দিতে পারবে না। সবকিছুই করতে হবে খুব সাবধানে। সতর্কতার সঙ্গে।’

শান্তি আর কথা না বলে মাথা নিচু করে থাকে। কথা উচ্চারিত হয় মাস্টারদার কণ্ঠ থেকে, ‘তোমরা ভুলে যেও না রাউলাট অ্যাক্ট-এর কথা। আমি অনেকবার তোমাদেরকে একথা বলেছি। ইংরেজরা এমন এক আইন প্রণয়ন করল, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয়দের দমন করে রাখা। এই আইনের দ্বারা তারা যে কোনো ভারতীয়কে যতদিন খুশি জেলখানায় আটকে রাখতে পারবে। মনে রাখতে হবে, সাবধানতা আমাদের একটি বড়ো অস্ত্র।’

নির্মল সেন খানিকটুকু নিস্তব্ধতার পরে বলল, ‘আজ রাতে কিছুক্ষণ রিভলবার আর বন্দুক চালনা প্রশিক্ষণ হবে।’

‘হ্যাঁ, তা তোমরা করতে পার। তবে বেশি রাত কোরো না। আশপাশের সব লোককে তো আর বিশ্বাস করা যায় না। যদিও এই গ্রামটি এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য নিরাপদ।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নির্মল সেন বলে, ‘বলা যায় না, কখন যে কী হয়। আমাদের তো পায়ে পায়ে বিপদ। বাঙালি দালালরা তো ওত পেতে থাকে। শাসকের হাতে একজন বিপ্লবীকে তুলে দিতে পেরে ধন্য হয়।’

‘সব দেশেই এমন একদল লোক থাকে বন্ধু। তারপরও পঁচানব্বই ভাগ মানুষ দেশের মুক্তির পক্ষে।’

‘ওদের বিশ্বাসঘাতকতা নেই বলেই তো আমরা কাজ করতে পারছি। তুইও নির্মলের সঙ্গে প্রশিক্ষণে থাক শান্তি। ভোলাও থাকবে।’

‘আমি?’

শান্তি কাঁচুমাচু স্বরে মাস্টারদার দিকে তাকায়।

‘তুই কি পারবি?’

‘হ্যাঁ, আমি পারব। পারব মাস্টারদা।’

ছোটোখাটো মানুষটির চোখের দিকে তাকাতে শান্তির বুক ধড়ফড় করে। ভয়ে কুঁকড়ে থাকে।

মাস্টারদা নির্মল সেনের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘ও যখন এখানে এসেই পড়েছে, অস্ত্র চালনার হাতেখড়ি দাও। শুরুতো হোক। ভোলা—

‘আজ্ঞে মাস্টারদা।’

‘বেশি রাত জাগবি না।’

অপূর্ব ঘাড় নাড়ে। মাস্টারদা উপরে উঠে যায়। সবাই জানে, অনেক রাত পর্যন্ত লিখবে, পড়বে। আবার কোন ভোরে উঠবে, কেউ তা টেরও পাবে না। কোনো কোনো মানুষের রহস্য বোঝা কঠিন। বুঝতে চাওয়াও বোকামি। ব্যক্তির শক্তি ব্যক্তিই নিয়ন্ত্রণ করে। তার প্রভা ছড়ায় অন্যের বলয়ে। বলয় আলোকিত হয়। দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন দেখতে পায় মাস্টারদা মইয়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

রাতের প্রশিক্ষণ শান্তির জন্য খুব লজ্জার হল। ও কিছুতেই বন্দুকের ঘোড়া টানতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নির্মল সেন হেসে বলে, 'তখনই জানতাম তুই পারবি না। গাধা একটা। যা ঘুমুতে যা। রানি, বোনকে নিয়ে তুমিও যাও। আমি মাস্টারদার মতো ছদ্মনামে ডাকতে পারব না। আমার কাছে রানি, রানিই।'

প্রীতিলতা ঘরে আসে। এই নিশুতি রাতে রামকৃষ্ণ ওকে সামনে এসে দাঁড়ায়। রামকৃষ্ণ ওর ছদ্মনামে ডাকত না। জেলের পাহারাদারদের সামনে ওকে আরতি বলেই ডাকত। আর ফিসফিসিয়ে বলত, 'বৃষ্টি। তুমি আমার বৃষ্টি। হাজার হাজার বছর ধরে বৃষ্টি হয়ে ঝরেই যাচ্ছ আমার ওপর।' সেই মুহূর্তে নিজেকে বৃষ্টিস্নাত মেয়ে বলে মনে হত। চট্টগ্রামের আসকার দিঘির পাড়ের বাড়িতে কতভাবে বৃষ্টি দেখেছে—গাছের মাথায়, দূর পাহাড়ের মাথায়, ঝর্নার জলে, ধানখেতে, খোলা মাঠের ওপরে ধোঁয়াটে হয়ে থাকা দিগন্তে। রামকৃষ্ণের জন্য নিজের দেখা বৃষ্টির সবটুকুই তো ও। মৃত্যুদণ্ড ওকে দূরে নিয়ে গেছে। খালি চোখে হৃদয়ের চোখ তো বুজে যায় না। প্রীতিলতার অস্থির লাগে। উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

'কী হয়েছে, দিদি?'

'কিছু না। ঘুম আসছে না।'

'চোখ বুজে শুয়ে থাক। ঘুম এমনিতেই আসবে।'

'ঠিক বলেছিস? আসবে তো?'

শান্তি বুঝতে পারে, দিদি ওর সঙ্গে রসিকতা করছে। ও এও বুঝতে পারে যে, দিদির কিছু একটা হয়েছে। দিদি অস্থির। সে জন্য ঘুম আসছে না।

'শান্তি, তুই ঘুমিয়ে পড়। আমি বই পড়ব।'

'কী বই পড়বে?'

'বাঘা যতীনের—'

'বাঘা যতীন? সে তো তোমাকে অনেকবার পড়তে দেখেছি।'

'বিপ্লবীদের কথা বারবার পড়তে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘ঠিক আছে, পড়। আমি শুয়ে পড়ছি।’

প্রীতিলতা আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরে পায়চারি করে। বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ শোনে। শেয়ালের ডাক ভেসে আসে দূর থেকে। সেই ডাক কাছে আসে। সেই ডাক মাথার ভেতরে তীব্র ধ্বনি ঝনঝনিয়ে তোলে। যেন বিশাল ঘণ্টা দ্রুতলয়ে বেজে যাচ্ছে, আর সেই তালে তালে ফাঁসির রজ্জুতে ঢুকে যাচ্ছে রামকৃষ্ণের মাথা। ওহ্ কৃষ্ণ! প্রীতিলতা জানালার শিকে মাথা রাখে। আকস্মিকভাবে শেয়ালের ডাক থেমে যায় বাইরে। যেন এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে সময়।

পরদিন দুপুরে, খাবারের পর মাস্টারদা শান্তিকে ডেকে বলে, ‘আমার সঙ্গে বস, তোকে ডিকটেশন নিতে হবে।’

শান্তি অস্ফুট স্বরে বলে, ‘ডিকটেশন?’

মাস্টারদা তীব্র চোখে তাকায়। বলে, ‘শব্দটার মানে জানিস না?’

‘জানি।’

‘তবে আবার প্রশ্ন কেন?’

‘ভয় লাগছে।’ শান্তি মাথা নিচু করে রাখে।

‘ভয়! মনের মধ্যে ভয় রেখে বিপ্লব হবে না।’

শান্তির মনে হয়, আমি কি ধলঘাটে এসেছি মাস্টারদার ইংরেজি ডিকটেশন নেওয়ার জন্য? পরক্ষণে মনে হয়, আমি তো কাল রাতে বন্দুকের ঘোড়াও টানতে পারলাম না। তাহলে আমি কি কোনো কাজে লাগব না? ডিকটেশন নেওয়া তো সহজ কাজই। ও দ্রুত কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে মাস্টারদার সামনে বসে। গত রাতে ওর নিজেরও ভালো ঘুম হয়নি। একে অচেনা অজানা জায়গা, তার ওপর দিদির নির্ঘুম রাত কাটানো, ওকে মোটেও স্বস্তি দেয়নি। বারবারই ঘুম ভেঙে গেছে। উঠেছে। জল খাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খেতে পারেনি। ঘরে, জল ছিল না। এক সময় দেখেছে জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকছে। একটু একটু করে ঘরের আঁধার কেটে যাচ্ছে, আলোর মাত্রা বাড়ছে। আরো একটু পরে দেখেছে আলোয় ঘর ভরে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পাখিরা শান্ত হয়ে কিচিরমিচির কমিয়েছে। ভোরের এতকিছু ওর ঘুমের প্রভাব আবারও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওর মনে হচ্ছে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। চোখ ঢুলছে। এসবের মাঝে হাত থেকে পেনসিল পড়ে যায়।

মাস্টারদার এক ধমকে ধড়ফড়িয়ে সোজা হয়ে বসে শান্তি।

তিনি হেসে বলেন, 'ফুলতার কী যে একটা সঙ্গে করে এনেছে, ভেবেই পাই না। এত অল্পেই ঘুম পায় কেন রে? এসব ছেলেমানুষ দিয়ে কী করব আমি? এসব ছেলেমানুষ আমার কী কাজে লাগবে বলতো?'

নির্মল সেন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'আহা এত বকছেন কেন ওকে? ওর অনেক মনের জোর আছে, নাকি রে শান্তি?'

সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা আবারও ধমকের স্বরে বলে, 'শুধু মনের জোর থাকলে হবে, নাকি গায়ের জোরও লাগবে? কাল রাতে বন্দুকের ঘোড়া টানতে পারল না। তোর কি গায়ের জোর নেই না কী রে?'

শান্তি চুপ করে থাকে। ও জানে ওর বলার কিছু নেই। লজ্জায় অধোবদন হয়ে যায়। ভাবে, মাটি ফাঁক হলে সেখানেই ঢুকে পড়বে। কিন্তু উপায় নেই। কোনো কিছুই ঘটবে না এখন।

মাস্টারদা আবার বলে, 'রোজ ব্যায়াম করবি মেয়ে। ছোলা-মুগ ভিজিয়ে খাবি। বুঝলি? শরীরের শক্তি চাই। নইলে বিপ্লবী হওয়া যাবে না। আর শরীরে শক্তি থাকলে, মনেও শক্তি থাকবে।'

শান্তি মনে মনে ভাবে মাস্টারদা বোধহয় লোহা দিয়ে গড়া। তার শরীরের কোথাও মাটি নেই। বিপ্লবীদের ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্বলতা তার চোখ এড়ায় না। বিপ্লবীদের সব দুর্বলতা সংশোধনের জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর। এক আশ্চর্য মানুষ। মাস্টারদা সম্পর্কে এমন ধারণা নিয়ে শান্তি ফিরে আসে ধলঘাট থেকে। ফিরে আসে প্রীতিলতাও। তার অনুভব অন্যরকম।

ইউরোপিয়ান ক্লাবে আঘাত হানার চিন্তা করছে মাস্টারদা। এর নেতৃত্ব দেবে একজন মেয়ে। প্রীতিলতাকে নেতৃত্বের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তাকে আরও শক্ত করে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণ দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি।

দু-দিন পরই আবার ডাক পড়ে প্রীতিলতার। যেতে হবে ধলঘাটে।

আবার মাটির বাড়িটির দোতলায় জমে ওঠে বৈঠক। নির্মল সেন শুরুতেই বলে, 'মাস্টারদা মেয়েদের দিয়ে ইংরেজ মহলে আঘাত হানার যে স্বপ্ন আপনি দেখছেন, তার জন্য রানিই উপযুক্ত বলে আমি মনে করি। ওর মনের জোর আমাকে সে ভরসা দিচ্ছে। ওর সাহস, ওর বড়ো শক্তি।

মাস্টারদা দ্বিধা নিয়ে বলে, 'ও কি ওর বাবা-মা ভাইবোনকে ছেড়ে এগিয়ে আসতে পারবে? ওদেরকে ও খুব ভালোবাসে। তাছাড়া বছরখানেক ধরে ওর বাবার চাকরি নেই। ওর বাবা-মা আশা করে যে, মেয়েটি সংসারের হাল ধরবে।'

নির্মল সেন একটুক্ষণ থমকে থেকে বলে, 'ঠিক আছে, ওর সঙ্গে আরো আলাপ করে দেখি।'

দুজনের বৈঠকে প্রীতিলতাকে বাইরে রাখা হয়েছিল। মাস্টারদা উঠে গেলে নির্মল সেন ভোলাকে বলে ওকে ডাকতে।

নির্মল সেন ওকে বলে, 'কী রে বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে?'

'এখনই মন খারাপ করবে কেন? এই তো এলাম।'

'যেতে চাইবি না তো?'

'আমাকে যদি পলাতক জীবনে থাকতে দেওয়া হয়, তাহলে আমি একই পথের যাত্রী হতে চাই।'

'তোর ওপর তো তোর বাবা-মার অনেক ভরসা। সংসারের হাল ধরবি, এই আশায় আছে ওরা। পারবি বাবা-মাকে দুঃখ দিতে?'

'আমার বাবা আমাকে নিয়ে গর্ব করে। আমি লেখাপড়া শিখেছি দেখে বাবা আনন্দও পায়। আমি তো এটাও জানি নির্মলদা যে, যে পথে এসেছি, সে পথে থাকতে হলে তাদেরকে ছাড়তে হবে। তারা মনে কষ্ট পাবে, সেটা আমি বুঝি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা মাথা নত করে। এরপর সোজা হয়ে উঠে বলে, 'দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আমি দেব আমার বুকের রক্ত, আর বাবা-মা দেবেন তাদের অশ্রুজল।'

ঘরজুড়ে গমগম করে বিপ্লবী প্রীতিলতার তারুণ্যভরা কণ্ঠস্বর। নির্মল সেন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, এমন অপরূপ দৃশ্য তার জীবনে আর একটিও দেখা হয়নি। রানির এই সাহস আজ অন্য এক বার্তা বয়ে এনেছে এই ঘরে।

বাইরে দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। সূর্যের শেষ আভা ছড়িয়ে আছে ধলঘাট গ্রামে। সন্ধ্যা নামছে।

প্রীতিলতা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে আছে। সে রাতেই সিদ্ধান্ত হল প্রীতিলতাকেই দেওয়া হবে দায়িত্ব, ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের।

মাস্টারদা ওকে বলল, 'তুই কালই চট্টগ্রাম ফিরে যা। আবার তোকে ডেকে পাঠাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১৬

নন্দনকাননের বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রীতিলতা। স্কুল চালিয়ে, ছাত্রী পড়িয়ে ওর সময় ভালোই কাটে। এই ভালো থাকার সঙ্গে 'প্রতীক্ষা' শব্দটি যুক্ত হয়। প্রতি মুহূর্তের প্রতীক্ষা। কখন ডাক আসবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য!

মাঝে মাঝে তারাভরা আকাশের নীচে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসর বসে। বাবা-মা খুশি। বলে, 'মেয়েটার টাকায় সংসারের অভাব কেটেছে।'

'আমি আর কতটুকু দিতে পারি বাবা।'

'অনেক, অনেক রে। এই বা আমরা কোথায় পেতাম?'

মাঝে মাঝে শান্তি ঝর্নার ধারে বসে বলে, 'দিদি, কবে না তোমার আবার ধলঘাট যাওয়ার ডাক আসে! এমনই তো কথা হয়েছে।'

'অপেক্ষার দিন গুনছি আমি।'

'ডাক এলে যাবে?'

'যাব না মানে! একশোবার যাব। এই দিনের অপেক্ষায় আছি।'

শান্তি চুপ করে থাকে। কথা আর বেশি এগোয় না। শান্তির মনে হয় দিদি এখন এই আসকার দিঘির পাড়ের বন-পাখি-জলরাশি-পাথরখণ্ডের মধ্যে নেই। দিদি হারিয়ে গেছে মহাকাশে—হাজার হাজার নক্ষত্রের মতো দিদির চোখ জ্বলছে। ও একদৃষ্টে মায়ের পেটের বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোনটিকে ওর আপন করে চেনাই হল না। কোনোদিন চিনতেও পারবে না।

অবশেষে প্রীতিলতার প্রতীক্ষার অবসান হয়। ডাক আসে ধলঘাটে যাওয়ার। অপূর্ব খবর নিয়ে এসেছে। পরদিন ও প্রীতিলতাকে নিয়ে সন্ধ্যার পরে যাবে। মাস্টারদা নির্মল সেনও সেখানে যাবে। ওখানে বসে পরবর্তী অ্যাকশনের পরিকল্পনা হবে। এই খবরে আনন্দে-উত্তেজনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা অভিভূত হয়ে থাকে। নিজেকে একজন বীর নারী ভেবে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে তৈরি করার সাধনা এখন প্রীতিলতার নিমগ্নতায়।

বাড়িতে ঢোকার আগে আর একবার দেখে যাওয়া বাড়িটিকে নতুন করে দেখল। ভোলা জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছ?'

'মাটির বাড়িটি বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্র। এই বাড়ির এক বিপ্লবী সদস্য ভোলা।'

ভোলা হেসে গড়িয়ে পড়ে। জোরে হাসতে পারে না ও। এই বাড়িতে জোরে হাসা নিষেধ। শব্দ যেন বাইরে না যায়। শব্দ যেন বিপ্লবীদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে না দেয়। ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িটি মাটির দোতলা। সাবিত্রী বিধবা। একমাত্র ছেলে রামকৃষ্ণকে নিয়ে থাকে। ছোটো মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। স্নেহলতা তখন মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে। বাড়ির পেছন দিকে ছিল পানায় ভরা গড়। আকস্মিকভাবে কোনো বিপদ হলে ওই গড় দিয়ে যেন পালানো যায়, সে ব্যবস্থা করা ছিল। নির্ধারিত তারিখে সন্ধ্যায় সূর্য সেন ও নির্মল সেন এসে পৌঁছোয়। তার কিছুক্ষণ পর অপূর্বর সঙ্গে প্রীতিলতা আসে।

ছোটো ব্যাগটি বারান্দার ওপর রেখে প্রীতিলতা সাবিত্রী দেবীকে প্রণাম করে। কেমন আছে জিজ্ঞেস করে। বুঝতে পারে বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা তাকে বিষণ্ণ করে রাখে। কিন্তু মনের জোর অনেক। সেই জোরের মধ্যে পদ্মের কুঁড়ি হয়ে আছে দেশমাতৃকার মুক্তি। গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, ওই কুঁড়ি ফুটবে। কেউ তার বিকাশ রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না।

প্রীতিলতা মাসিকে বলে, 'আজ আমি সবাইকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াব।' সাবিত্রী দেবী বলে, 'স্নেহলতাকে পাঠিয়েছি পাশের বাড়ি থেকে হাঁসের ডিম আনতে। মেয়েটা কেন যে এত দেরি করছে?'

'এসে যাবে মাসি। চিন্তার কিছু নেই।'

'ভয়তো একটাই। বাড়িটাকে যেন কেউ সন্দেহ না করে। খবর জানার জন্য ওকে জেরা করছে কিনা কে জানে। যাকগে, এত কিছু ভেবে লাভ নেই।'

অপূর্ব বলে, 'দিদিকে রান্নায় আমি হেল্প্ করব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘কী হেল্প্ করবে?’

‘কাটাকুটি, মশলা-বাটা সব। সবই পারব।’

‘দেখা যাক।’

‘হ্যাঁ, দেখে নিও দিদি।’

অপূর্ব হাসিমুখে তাকায়। আমুদে ছেলে। হেসেই দিন যায় ওর। তবে কাজের সময় খুব সিরিয়াস। একটি বিষয় দু-বার বোঝাতে হয় না।

সাবিত্রী রান্নাঘরে যায়, পেছনে প্রীতিলতা ও অপূর্ব যায়। ততক্ষণে ডিম নিয়ে স্নেহলতাও হাজির।

মায়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, ‘কীরে এত দেরি হল যে?’

‘কাকাবাবু কত কিছু প্রশ্ন করলেন। কারা এসেছে, কয়জন এসেছে, কেন এসেছে, কতক্ষণ থাকবে—এইসব।’

‘তুই কী বললি?’

‘আমি বলেছি, ওরা সবাই শহর থেকে এসেছে। আজ রাতটুকু থাকবে। কাল ভোরে চলে যাবে। জিজ্ঞেস করল, কাল ভোরে কোথায় যাবে? আমি বললাম, তার আমি কি জানি। একথা আমি জানি না।’

শুনে সাবিত্রী চিন্তিত হয়। পাশের বাড়ির লোকটি সরকারের ধামাধরা। ওর বাড়িতে লোকজন এলেই সে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে এবং নানা ধরনের প্রশ্ন করে। সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে বিপ্লবীরা আসে, এই ধরনের সন্দেহ তার মনে আছে। তার দৃষ্টি এবং কথার ধরন সাবিত্রীর পছন্দ হয় না। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় ভুরু কুঁচকে রাখে। মহাবিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু লোকটি তা গায়ে মাখে বলে মনে হয় না।

প্রীতিলতা ও অপূর্বর মনে অন্য চিন্তা নেই। ওরা দুজনে মহা উৎসাহে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। রান্নার আয়োজন তেমন কিছু নয়। তারপরও দুজনে এমন খুশি যে, আজ একটি উৎসবের দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উৎসবের রান্নায় আয়োজন কম থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আনন্দ থাকতে হবে পূর্ণ মাত্রায়। দুজনের মাঝে তেমন একটি উৎসবের সময়। কিন্তু সাবিত্রী দেবী চিন্তিত মুখে ঘরের বারান্দায় দাঁড়ায়, কিছু করার চিন্তা করে উঠোনে নেমে যায়। লেবু গাছের গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়ায়। শুনতে পায়, রান্নাঘর থেকে ওদের কথা ভেসে আসছে।

অপূর্ব বলে, 'দিদি, আমি কিন্তু ভাত খাব না। আমার গায়ে জ্বর।'

'ঠিক আছে, তোমাকে সাগু রান্না করে দেব। হবে তো?'

'হবে না মানে? তোমার হাতের রান্না অমৃতসমান, অপূর্ব সেন কহে খায় ভাগ্যবান।'

দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। কেরোসিনের কুপি জ্বলে টিমটিম করে। বাতাসে ছায়া কাঁপে। তখন ধলঘাটের এই বাড়ির ওপরে পুঞ্জিভূত হয় ঘন কালো মেঘ। ঝোড়ো বাতাসের পূর্বাভাসে উড়ে আসে বিপদ-সংকেত। সাবিত্রী কিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু গা ছমছম করে। পাশের বাড়ির লোকটি সূর্য সেনের নামে ঘোষিত পুরস্কারের টাকার কথা ভেবে অন্ধকারের ভেতর ছুটছে। ওর ধারণা, এই বাড়িতে সূর্য সেন থাকলে থাকতেও পারে। সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন? ধলঘাট পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়ার জন্য ও পড়িমড়ি করে দৌড়চ্ছে। কয়েকজন বিপ্লবীকে দিয়ে দেশের মুক্তি ওর কাছে ছাতুর মতো। এই ছাতুর জন্য সুযোগ হাতছাড়া করা কি উচিত? মোটেই না। বোকার স্বর্গে বাস করার মানেই হয় না। যত দ্রুত ক্যাম্পে পৌঁছে যাওয়া যায়, তত দ্রুত ওরা এই বাড়িতে পৌঁছে যাবে। উড়িয়ে দেবে বিপ্লবীদের স্বপ্ন।

রান্না শেষ। অপূর্বকে সাগু ঠান্ডা করে খেতে দেয় প্রীতিলতা। সাবিত্রী দেবী বাকিদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ভাত খাওয়ার জন্য সবাইকে আসতে বলে সাবিত্রী। নির্মল সেনকেও ডাকে, যদিও সে আগেই বলে দিয়েছিল, রাতে ভাত খাবে না। মাস্টারদার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে দেওয়া হয়েছে। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করে প্রীতিলতার। মাস্টারদার সঙ্গে একসাথে খেতে হবে? ওতো সাধারণত নির্মল সেনের পাতেই খায়। ও মাস্টারদাকে বসতে দেখে একছুটে উপরে যায়। নির্মল সেন বিছানায় শুয়ে আছে। কে জানে কী ভাবছে, প্রীতিলতাকে ঢুকতে দেখেও তাকায় না। ও দ্রুতকণ্ঠে বলে, 'মাস্টারদার সঙ্গে খেতে আমি লজ্জা পাই। তাঁর সঙ্গে ভাত খেতে পারব না। তাই পালিয়ে এসেছি। পালিয়ে এসেও লজ্জা করছে। আপনি চলুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নির্মল সেন হাসতে হাসতে বলে, 'কেমন জব্দ হলে রানি। বোঝ মজা! আমি যাচ্ছি না ভাত খেতে।'

ঠিক তখনই মাস্টারদা মই বেয়ে উপরে উঠে আসে, ছোটোখাটো মানুষটির পায়ে যেন বিদ্যুতের গতি ভর করেছে। ঘরে ঢুকেই বেশ জোরে জোরে বলে, 'পুলিশ এসেছে, পুলিশ।'

'পুলিশ!'—নির্মল সেন ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

'পুলিশ!'—প্রীতিলতা চোখ বড়ো করে উচ্চারণ করে। 'আমি আপনাদের সঙ্গে এখানে থাকব মাস্টারদা।'

তিনি আদেশের স্বরে বলেন, 'না। নীচে যাও। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থাক। তাদের আত্মীয় বলে পরিচয় দেবে। যাও।'

ধমক শুনে মই বেয়ে নীচে নেমে যায় প্রীতিলতা।

উপরে থাকে মাস্টারদা, নির্মল সেন ও অপূর্ব।

ওরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়ির পেছন দিকে পালাবার যে ব্যবস্থা আছে, সেখান দিয়ে সূর্য সেন ও প্রীতিলতাকে বাঁচাবার সিদ্ধান্ত হয়। নির্মল সেন রিভলবার হাতে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশ বাহিনী বাড়ি ঘিরে ধরেছে। সাবিত্রী দেবী ওদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, 'আমি একজন বিধবা বুড়ি মেয়েমানুষ। বাড়িতে আমার যুবতী মেয়েরা রয়েছে। আমার বাড়িতে এত রাতে কেন হামলা করতে এসেছ?'

পুলিশ জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ির মধ্যে কি বাইরের লোক আছে?'

'না, নেই।'

'যদি কেউ থাকে তাহলে তাদের বের করে দেন।'

'যত সব বাজে কথা। কেউ নেই। শুধু শুধু মেয়েদের ওপর জুলুম করতে এসেছ।'

এই কথা কাটাকাটির ফাঁকে কিছুটা সময় পাওয়া যায়। ক্ষণিকের সময়ই মাত্র। ততক্ষণে ক্যাপ্টেন ক্যামারন রিভলবার হাতে মইয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। এক পা ওঠায় মইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওপর। নির্মল সেন সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে গুলি করে। গুলি চালাতেই থাকে। ক্যামারন গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। উপর থেকে মাস্টারদা গুলি বর্ষণ করছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছে নির্মল সেন। নীচ থেকে পুলিশ-সদস্যদের ছোঁড়া গুলি আসছে অনবরত। গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেদ করে দিচ্ছে অন্ধকার। ছুটছে চারদিকে—আলোড়িত হচ্ছে ধলঘাট গ্রাম।

গুলিবিদ্ধ নির্মল সেনের আর্তনাদ পৌঁছোয় প্রীতিলতার কানে। ব্যথা-কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে ডাকছে, 'রানি রানি।' সবার সঙ্গে বসে থাকা প্রীতিলতা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। আকস্মিকভাবে মনে হয়, একজন মুমূর্ষু বিপ্লবীর কাছে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। কিন্তু ওর হাত টেনে ধরে সাবিত্রী, স্নেহলতা, রামকৃষ্ণ। ওদের বাঁধন থেকে প্রীতিলতা নিজেকে ছাড়াতে পারল না। বুকের ভেতর প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে তড়পায় ও। মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না ভেবে। নীচ থেকে বোঝা যাচ্ছে না মাস্টারদাই-বা কেমন আছে? তার গায়েও কি গুলি লেগেছে? নাকি ঠিক আছেন? নাকি তারাও শেষ?

এক সময় গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়। মাস্টারদা আর অপূর্ব উপর থেকে নেমে আসে। প্রীতিলতা ছুটে গিয়ে দাঁড়ালে মাস্টারদা ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব রে?'

প্রীতিলতা তাকে প্রণাম করে বলে, 'মাস্টারদা আমাকে রেখে যাবেন না। আমি আপনার সঙ্গেই যাব।'

একথা বলে ও সঙ্গে সঙ্গে অপূর্বর দিকে তাকায়। মনে হয়, অপূর্ব দেখছে ওকে। এত বড়ো বিপর্যয় দেখেও ও অস্থির নয়। শান্ত এবং সৌম্য ওর চেহারা। রিভলবারের ট্রিগারে আঙুলটি রেখে মাস্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে। মাস্টারদা দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'চল।' ওরা তিনজনে বাড়ির পেছনের পানাভরা গড়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। তিনজনে পরস্পরের হাত ধরে আছে। একটু পরে অপূর্ব দু-পা সামনে এগিয়ে যায়। নিজে পা ফেলে রাস্তা দেখে মাস্টারদাকে আসতে বলে। চারপাশে কিছুই দেখা যায় না। গাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় পায়ের নীচে শুকনো পাতা পড়লে খসখস করে ওঠে। খসখস শব্দ এড়ানোর জন্য চেষ্টা করে অপূর্ব। সম্ভব হয় না। ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতার হদিস রাখা মুশকিল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সেই শব্দ অনুসরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

করে গুলি চালায়। গুলি অপূর্বর বুক ভেদ করে চলে গেলে ও পড়ে যায়। পেছনে দেখা যায় টর্চের আলো। ছুটে আসছে পুলিশ। বুটের নীচে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় শুকনো পাতা। মাস্টারদার পালটা আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয় পুলিশটি, যে অপূর্বকে গুলিবিদ্ধ করেছে। তার পরপরই মাস্টারদা ও প্রীতিলতা পানাভরা ময়লা জলের মধ্যে নাক উঁচু করে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। ওই অবস্থাতেই প্রীতিলতার মনে হয়, চারদিক তোলপাড় করে বিপ্লবীদের আর্তকণ্ঠ ভেসে আসছে। অন্যরকম ধলঘাট গ্রাম ওদের সামনে-অন্ধকার, বনভূমি, ধানখেতে, চরাচর অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি হয়ে ফুটে উঠেছে। ওরা শুনতে পায়, পুলিশ বাহিনীর পায়ের শব্দ। গুলির শব্দ ছড়ায় চারদিকে। ঘোলা জলে নাক ভাসিয়ে ডুবে থাকা দুজন মানুষ চাঁদ এবং মেঘের দৃশ্যের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান সমান্তরাল করে ফেলে। ধরে নেয়, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবীদের দেশের সবটুকুর সঙ্গে এক হওয়ার নিয়তি এমন। মহিমান্বিত জীবনের সাড়ার পথে ক্ষণ আয়ু মানুষের চির আয়ু লাভ অমরত্বের সাধনা। প্রীতিলতা মুখটা উঁচু করে বলে, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!' সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদাও কণ্ঠ উঁচু করে বলে, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

আস্তে আস্তে সকাল হয়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্মচারীরা দলবলসহ ধলঘাট গ্রামে হাজির হয়েছে। দুজন বিপ্লবী যে পুলিশ কর্ডন উপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে চলে যেতে পেরেছে, তারা কি তা কেউ ভাবতে পারবে? তারা ভাবল, আরও বিদ্রোহী বাড়ির ভেতর আছে। তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে একজন, 'ভিতরে কে আছ বেরিয়ে এসো। নইলে সবকিছু ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে সাবিত্রী দেবী, স্নেহলতা ও রামকৃষ্ণ। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। আরো কিছুক্ষণ বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পর পুলিশ বাড়ির ভেতর ঢোকে। সিঁড়ির গোড়ায় ক্যাপ্টেন ক্যামারন রিভলবার হাতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। উপরতলায় ঘরের ভেতরে পড়ে আছে রক্তাক্ত নির্মল সেন। রক্ত-কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে বড়োসড়ো মরদেহ। বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোনায় লতাপাতা ঝোপের পাশে পড়ে আছে অপূর্ব।

পুলিশ নির্মল সেন ও অপূর্বর লাশ সাবিত্রী দেবীর উঠোনে নিয়ে আসে। ক্যামারনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাবিত্রীর দেবীর বাড়ি ধ্বংস করে। তারপর লাশ নিয়ে ধলঘাট ক্যাম্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চলে যায়।

চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেলে মাস্টারদা ও প্রীতিলতা গড়ের মধ্য থেকে উঠে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। এখানেও প্রীতিলতা সূর্য সেনের কাছে আবারও প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজে যোগদানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে।

সূর্য সেন নিশ্চুপ শোনে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে ভেবে দেখি। বর্তমানে তুমি তোমার স্কুলের কাজে যোগদান করো। আমি খবর পাঠালে আত্মগোপনে চলে যাবে। অনেক দিনের জন্য আত্মগোপন। বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলো।'

'আপনি ভাববেন না। আমি তাদের বোঝাতে পারব। 'আমি চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে চাই। কারণ, ওই ক্লাবটির বাইরের ফলকে লেখা আছে 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ।' ওই লেখাটি দেখলে আমার শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে।'

'আমারও। ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল ওই ক্লাবটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত আমরা একবার নিয়েছিলাম। কিন্তু ওইদিন গুড-ফ্রাইডে হওয়ায় ক্লাব বন্ধ ছিল। তাই সেই কর্মসূচি আর বাস্তবায়িত হয়নি। এখন আবার নতুন করে এই ব্যাপারে ভাবব।'

এই কথা শুনে খুশিতে প্রীতিলতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সূর্য সেন কঠিন গলায় বলে, 'তবে খুব সাবধান। কল্পনা ধরা পড়ায় বেশ ক্ষতি হয়ে গেছে।'

প্রীতিলতা মাথা নাড়ে। ও জানে, গোপন বিপ্লবী কাজে যাওয়ার সময় কল্পনা ও আর একটি ছেলে পাহাড়তলির ভেলুয়া দিঘির পাড়ে ধরা পড়ে। কল্পনা পুরুষের পোশাক পরে ছিল। ওদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের হয়। হাকিম কল্পনাকে জামিনে মুক্তি দেয়।

সূর্য সেন তখন বলে, 'প্রত্যক্ষ আক্রমণে যাওয়ার আগে তোমাকে কয়েকদিন অস্ত্র-চালনা শিখতে হবে।'

'আমি রাজি।'

প্রীতিলতার ভেতরে প্রবল উত্তেজনা। ও থরথর করে কাঁপে। তারপর সূর্য সেনের নির্দেশে ফিরে যায় পিত্রালয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১৭

একদিন আগে ধলঘাটের খবর পেয়েছে শান্তি বাবার কাছ থেকে। খবরটা শুনে দৌড়ে গিয়ে ঝর্নার জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছে, নিজেকে শান্ত করার জন্য। মনে হচ্ছিল, নিজের শরীর পুড়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। একখণ্ড পাথরের উপর বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, দিদি কি বেঁচে আছে?

বাবা শুধু ধলঘাটে বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্রে পুলিশি হামলার খবর পেয়েছে। আর কোনো কিছুই জানতে পারেনি। বাড়িতে বসে বাবা-মা কাঁদছে। এক সময় কান্না ফুরোয় শান্তির। ঝর্নার জলের সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে দিয়ে মুখ ধুয়ে নেয়। বুকের ভেতর প্রতীক্ষার যন্ত্রণা তড়পায়। দিদি ফিরবে—বেঁচে থাকলে দিদিকে তো ফিরতেই হবে। রাতে ঘুম আসে না। সামান্য শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বুঝি জানালায় কেউ টুকটুক শব্দ করছে। বিছানা থেকে উঠে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় শান্তি। না, আর কোনো শব্দ নাই।

পরদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি আসে প্রীতিলতা। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে বোঝা যায়। এক মাথা লম্বা চুলে কাদা লেগে আছে। এলোমেলো চুলের গোছায় ঝোড়ো বাতাসের ঘূর্ণি লেগেছে মনে হয়। জামা-কাপড় শ্রীহীন—ধুলোবালিতে মাখামাখি হয়ে আছে। এই বাড়িতে এমন অদ্ভুতকিমাকার কেউ কোনোদিন তো ছিল না। এখন কোথা থেকে এল? সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

মুখ খোলে প্রতিভা—'কোথায় ছিলি রানি? এমন চেহারা হয়েছে কেন? তুই কি মাটিতে গড়াগড়ি করে কেঁদেছিস?'

প্রীতিলতা দু-পা এগিয়ে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, 'সব কথার উত্তর দেব মাগো। আগে খেতে দাও। আমার সঙ্গে তোমার একটি ছেলেও আছে। ওরও ভীষণ খিদে পেয়েছে মা।'

সন্ধ্যা উতরেছে মাত্র। প্রতিভার রান্না তখনো শেষ হয়নি। ওদেরকে ভাত আর ডিমের ওমলেট খেতে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা বলে, 'আজ আমরা ডিম খেতে পারব না। তোমার মেয়ে খাবে না, ছেলেও না।'

প্রতিভা অবাক হয়, 'কেন রে? কী হয়েছে তোদের?'

প্রীতিলতা ঠান্ডা মাথায় সংযত কণ্ঠে বলে, 'নির্মলদা আর অপূর্ব মারা গেছে। আমরা তো সব এক গোত্রের। তুমি তো জানোই মা যে, আমরা সবাই গোত্রান্তরিত। আমরা সকলেই এক গোত্রের। এখন আমরা দশ দিন অশৌচ পালন করব।'

প্রতিভা ধমক দিয়ে ওঠে, 'রানি!'

'আমি জানি, তুমি সব বোঝ। তুমি আমার সোনা মা।'

'তুই এসব কী বলছিস?'

'আমি জানি, তুমি সবই বোঝ মা।'

'না, বুঝি না। বুঝি না।' প্রতিভার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর। 'স্বদেশি ছেলেদের খিদে পেলে খেতে দিবি, তা ঠিক আছে। মানলাম। তাই বলে তাদের সঙ্গে তোর গোত্র এক হবে, এসব তো আমি তোর মুখ থেকে শুনতে চাই না। ভীষণ বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে আমার। বাবার জন্মেও এমনটি দেখিনি।'

প্রতিভা রাগ করে চলে যায়। শান্তি দেখতে পায়, মা রান্নাঘরে বসে চোখের জল মুছছে। তারপর আতপ চালের ভাত আর আলুসেদ্ধ দিয়ে দুজনকে খেতে দেয়। প্রীতিলতার খাওয়া দেখে শান্তির মনে হয়, এই দু-দিনের মধ্যে ভাত খাওয়া হয়নি ওর দিদির। খাওয়া শেষ হলে শান্তির সঙ্গে তেমন কথা হয় না ওর দিদির। বিপ্লবী ছেলেটি চলে গেলে প্রীতিলতা বিছানায় যায়।

অনেক রাতে বাড়ির সামনে বুটের শব্দ শুনে ঘুম ভাঙে প্রীতিলতার। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরও। দুজনে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে।

প্রীতিলতা শান্তিকে বলে, 'যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। পুলিশ এসে গেছে।'

ও বাড়ির অন্যদের বাবা-মায়ের ঘরে জড়ো করে বলে, 'তোমরা পুলিশের কাছে বলবে যে, এ কয়দিন আমি বাড়িতে ছিলাম। অন্য কোথাও যাইনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

জগবন্ধু চেঁচিয়ে বলে, 'পুলিশ? পুলিশ কেন আসবে?'

প্রীতিলতা বাবার মুখ চেপে ধরে বলে, 'চেঁচিও না বাবা। আস্তে কথা বলো। চেঁচালে বিপদ হতে পারে। পুলিশ কেন এসেছে, তা আমি পরে বলব।'

ভয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে চুপ করে বসে রইল সবাই। মধ্যরাতের প্রহর কেটে গেল। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই দরজায় কড়া নাড়ল পুলিশ। জগবন্ধু থরথর করে কেঁপে-ওঠা পায়ের কাঁপুনি থামিয়ে ভীতি-উদ্বেগ নিয়ে দরজা খুলে দেয়।

এরপর শুরু হল পুলিশের বাড়ি-তল্লাশি। সে আচরণ কোনো নিয়মকানুন শৃঙ্খলার মধ্যে ছিল না। রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি-পাতিল-গ্লাস-বাসন ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। চাল-ডাল-মশলা-তেল ঢেলে দিল উঠোনে। তোশক বালিশের তুলো উড়িয়ে দিল ঘরের সামনে। বই, খাতাপত্র ছিঁড়ে স্তূপ বানাল বারান্দায়।

এতকিছু শেষ করে প্রীতিলতাকে নিজের বাড়িতে অন্তরিন করে চলে গেল পুলিশ। এভাবে কিছুদিন কাটল। বিপ্লবের পথে হাঁটবে বলে যে নিজেকে তৈরি করেছে, তার সামনে তো ঘরের দেওয়াল তুচ্ছ। এমন মেয়েকে পাহাড়-সমান প্রস্তরখণ্ডই শুধু আটকাতে পারে। মানুষের সাধ্য নেই তার পথ রোধ করার।

কয়েকদিন পরেই পলাতক জীবনে যাওয়ার জন্য মাস্টারদার নির্দেশ আসে। সেই অনুমতিপত্রটি শান্তির কাছে দিয়ে যায়, যে নিয়ে এসেছে সে। ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি জানে না যে, সেই চিঠিতে কী লেখা আছে? বিপ্লবী ছেলেটি চিঠি পৌঁছে দিয়ে দ্রুতপায়ে চলে যায়। শান্তি প্রীতিলতাকে চিঠিটা দেয়।

'কীসের চিঠি দিদি? বুঝতে পারছি না।'

'তোর এতকিছু বুঝতে হবে না।'

প্রীতিলতা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রতিভা শান্তির দিকে তাকিয়ে বলে, 'কার চিঠি নিয়ে এলি?'

শান্তি ঠোঁট উলটে, নাক কুঁচকে, হাত উলটে বলে, 'জানি না। তবে বিপ্লবীদের চিঠি হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হয়তো।'

'আবার কী বিপদ আসে কে জানে!' প্রতিভা গজগজ করতে করতে উঠোনে নেমে যায়।

সেদিনই দিদিকে অন্যরকম মনে হল, কিছুটা বিষণ্ণ, কিছুটা উৎফুল্ল। এক সময় শান্তিকে বলল, পলাতক জীবনে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে।

শান্তি আকস্মিক প্রশ্ন করে, 'আজই কি চলে যাবে তুমি?'

প্রীতিলতা চমকে উঠে বলে, 'কে বলল তোকে? আমি তো বলিনি।'

'কেউই বলেনি আমাকে। আমি ধরে নিচ্ছি। তোমার কাছে আসা চিঠিটি আমিই তোমার হাতে তুলে দিয়েছি দিদি।'

প্রীতিলতা সরাসরি তাকিয়ে বলে, 'ঠিক কাজ করেছিস। ভুল করলে আমি তোকে আস্ত রাখতাম না।'

শান্তি গলা উঁচিয়ে বলে, 'তোমাদের পলাতক জীবনের জায়গা তো আমি ধলঘাটে দেখে এসেছি। এভাবে পলাতক জীবন মেনে নিয়ে নির্মলদা আর অপূর্বদার মতো জীবন দিতে হবে। এভাবে জীবন দিতে দিতে সবাই মরে গেলে দেশের কী কাজ হবে?'

প্রীতিলতা দু-চোখে আগুন ছড়িয়ে শান্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ লাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, কয়লা রঙের ভেতরে আগুনে আভার বিচ্ছুরণ। শান্তি প্রথমে ভয় পায়, তারপর সাহসী হয়ে বলে, 'দিদি তুমি যেও না। দোহাই লাগে দিদি। গেলে তুমি আর ফিরে আসবে না।'

শান্তি চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। কান্নায় ওর কণ্ঠ ধরে আসে। প্রীতিলতা আবেগের জায়গা থেকে মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ধমকের স্বরে বলে, 'বেশি কথা বলছিস শান্তি। আর একটিও কথা বলবি না। তোকে আমি ধলঘাট পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি। এতদিন ধরে আমাকে দেখছিস। তোর কি কিছুই শেখা হয়নি শান্তি? ছিঃ, ছিঃ।'

দিদির ধিক্কারে শান্তি স্তব্ধ হয়ে যায়। বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। পুরো মুখজুড়ে বিষণ্ণতার ছায়া। গ্লানিবোধও মরমে মারছে ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা আবার বলে, 'আমি তো স্বাধীনতা যুদ্ধের নগণ্য সৈনিক। সেনাপতির আদেশ মেনে নেওয়া আমার কর্তব্য। এর থেকে একচুলও সরে আসতে পারব না। আজ আমার জীবনের সাফল্যের লড়াইয়ের সূচনার যাত্রা হবে। তোর চোখে আমি জল দেখতে চাই না শান্তি।'

'ঠিক আছে তুমি আমার চোখে জল দেখবে না। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

প্রীতিলতা মৃদু হেসে ওর মাথায় হাত রাখে।

দূর থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে প্রতিভা বলে, 'কি রে, কী করছিস তোরা?'

দিদি বলছে, 'দিদি চান করে হারমোনিয়াম নিয়ে বসবে। গান গাইবে।'

'তাই নাকি? তোর বাবা তো এখনো বাড়ি ফেরেনি।'

'বাবা তো বিকেলে কোনোদিন বাড়ি ফেরে না মা। বাবা ছাত্র পড়িয়ে রাতে ফেরে।'

'রানি কখন গান গাইবে?'

'যখন খুশি গাইবে। ও নিজে নিজেই গাইবে। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে শুনব।'

'তোদের কোনো কিছু আমি বুঝতে পারছি না।'

দুই বোন আর কথা বাড়ায় না। প্রীতিলতা গামছা নিয়ে স্নান করতে যায়। কাপড় বদলে ভেজা চুল ছেড়ে দেয় পিঠের ওপর। শান্তির বুক ধক্ করে ওঠে। ভাবে কী সুন্দর লাগছে দিদিকে! যেন রথের ওপর দাঁড়িয়ে দিদি দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে হাত নাড়ছে। কিন্তু দিদির শরীরে কোনো রক্ত নেই। শান্তি নিজেকে ধমকায়—এসব ভাবনার কোনো মানে হয় না।

অল্পক্ষণে নিজের কণ্ঠে নিজের প্রিয় গান তুলে নেয় প্রীতিলতা। বেজে ওঠে হারমোনিয়াম—

'অবনত ভারত চাহে তোমারে,

এসো সুদর্শনধারী মুরারী!...'

পুরো গানটি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল। উঠোনে দাঁড়িয়ে গানটি শুনে প্রতিভা শান্তিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর কি কিছু হয়েছে শান্তি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আমি জানি না মা।’

প্রতিভা মৃদুস্বরে বলে, ‘ভগবান। ভগবান।’

প্রীতিলতা অন্য গানে গেল -

‘আমায় সাজিয়ে দেমা,

আমি হব না তো গৃহবাসী!...

প্রতিভা ওর পরের গান শুনতে পায় না। গোরুর দেখাশোনার জন্য গোয়ালের দিকে গেছে। এই গান শুনে ঘরের কোণে বসে অঝোরে কাঁদে শান্তি। বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসে। ওর মনে পড়ে, আজ রথযাত্রা। দূরের রাস্তা থেকে রথ টানার ঘরঘর শব্দ ভেসে আসে। ও বাড়ির বাইরে আসে। প্রীতিলতা পেছনে। চারপাশে অন্য ভাইবোনেরা নেই। প্রীতিলতা এক মুহূর্তের জন্য শান্তিকে জড়িয়ে ধরে দ্রুতপায়ে সামনে এগিয়ে যায়। শান্তি দেখতে পায়, পুকুরপাড়ের পূর্ব দিকের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায় যে, বিপ্লবী ফুলতারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে আর এক বিপ্লবী। যেখানে যেতে হবে সে পথে ও নিয়ে যাবে ফুলতারকে। ফুলতার নামের প্রীতিলতা পেছন ফিরে তাকায় না। সামনের পাহাড়ের উপর সূর্যের শেষ আলো নিভে যাচ্ছে। ফুলতারকে আর দেখা যাচ্ছে না।

শান্তি শুনতে পায় পেছন থেকে মায়ের কণ্ঠস্বর, ‘রানি রানি, শান্তি-শান্তি কোথায় গেলি তোরা?’

শান্তি উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে, ‘তোমার এক মেয়ে কোথাও গিয়েছে মা। আর এক মেয়ে আছে। ও তোমার কাছেই থাকবে।’

প্রতিভা নিশ্চুপ থাকে। রানিকে তার চেনা হয়েছে। রানি এখন আর শুধু এই পরিবারের নয়। গোয়ালের গোরুগুলো হাম্বা হাম্বা স্বরে বাড়িটা সরগরম করে তুলেছে। প্রতিভা দেখতে যায় যে, গোরুগুলো এমন করে ডাকছে কেন?

গোয়াল ঘর থেকে ফিরে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শান্তিকে হাত ধরে ঝাঁকিয়ে প্রতিভা বলে, ‘রানি কই? ওকে দেখছি না কেন?’ প্রতিভা বাড়ির বাইরে গিয়ে, ‘রানি, রানি’ বলে ডেকে আবার উঠোনে ফিরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তুই কথা বলছিস না কেন, শান্তি?’

‘আমি কিছু জানলে তো বলব?’

প্রতিভা বারান্দায় এ-ঘরে, ও-ঘরে ছুটোছুটি করে—বাইরের বারান্দায় যায়, বাগানে, পুকুরের ধারে ছুটোছুটি করে ডাকে, ‘রানি, রানি?’

শান্তি ঘরের বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে নিজেকেই বলে, যে মেয়ে বাবা-মাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় তাকে তুমি কোথায় খুঁজবে মা? কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বারান্দায় আছড়ে পড়ে প্রতিভা। চিৎকার করে কিছুক্ষণ কেঁদে আঁচলে চোখ মুখে বলে, ‘এই তো কিছুক্ষণ আগে স্নান করল, গান গাইল—’

‘দিদির প্রিয় গান দিদি গেয়েছে মা।’

প্রতিভা আবার কাঁদতে শুরু করে, ‘মাগো ফিরে আয়, ফিরে আয়। আমি রান্নাঘরে তোর জন্য ভাত নিয়ে বসে থাকব।’

অল্পক্ষণে জগবন্ধু বাড়িতে ফিরে আসে। সব শুনে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, ‘ও বোধহয় বেশিদূর যেতে পারেনি। আমি ওকে ঠিকই রাস্তায় পাব। সব রাস্তা খুঁজব, সব রাস্তা—’

বাড়ির কেউ জগবন্ধুকে যেতে মানা করে না। জগবন্ধু চারদিকে খোঁজে। কখনো দ্রুতপায়ে হাঁটে, কখনো দৌড় দেয়—চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে বাড়িতে ফিরে আসে জগবন্ধু। কারো সঙ্গে কথা বলে না। না খেয়ে শুয়ে পড়ে। সবার উপর আঙুল উঁচিয়ে বলে, ‘কেউ আমাকে খেতে ডাকবে না।’

কয়েকদিন পর থেকেই পুলিশের আনাগোনা শুরু হয় বাড়িতে। জিজ্ঞাসাবাদে নাস্তানাবুদ করা হয় পরিবারের সবাইকে। সবচেয়ে ছোটো ছেলে সন্তোষের বয়স সাত। ওকেও নিয়ে গিয়ে থানায় রেখে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, ‘বল কাকে চিনিস এখানে?’

সন্তোষের একটাই উত্তর—‘কাউকে চিনি না তো।’

সত্যি কথা বল, ‘নইলে মেরে ফেলব।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ড্যাবড্যাব চোখে তাকিয়ে থাকে সন্তোষ। পিঠের ওপর দু-চার ঘা দিয়ে বলে, 'আবার মিথ্যা কথা বলবি?'

ও ধাম করে বলে, 'মারলে মেরে ফেল। শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে পারব না।'

'ওরে ত্যাঁদড়। দেখাচ্ছি মজা।'

পুলিশ ওকে মেঝেতে ফেলে বুটের নীচে চেপে রাখে। নিশ্চুপ পড়ে থাকে সন্তোষ। থানার লোকেরা ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বুঝে যায় যে, ছেলেটির নার্ভ খুব শক্ত। ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না।

বাড়ির উপর শুরু হল পুলিশের কড়া পাহারা। আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে যায়। পুলিশের ভয়ে জগবন্ধু ছাত্র পড়ানোর কাজ হারাতে থাকে। আর্থিক অবস্থায় চাপে পড়ে। নিরানন্দ শ্রীহীন হয়ে পড়ে পরিবার। প্রতিভার একটিই কথা, 'আমার রানি-শূন্য রাজ্য—।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা অধীর আগ্রহে দিন গোনে। ডায়রির পৃষ্ঠায় লিখে রাখে— '১৩ জুন, ১৯৩২।' ওই দিন ধলঘাটে সূর্য সেনের সঙ্গে কথা হয়। তারপর থেকে দিন যায় আর দিন যায়।' ডায়রির পৃষ্ঠায় কোনোদিন কিছু লেখে, কিছু লিখতে না পারলে বড়ো করে ক্রস করে রাখে। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার আগের ঘটনাগুলো ঘুরেফিরে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। বিছানার একপাশে ঘুমিয়ে আছে শান্তি। ও দিদিকে দেখতে এসেছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার এটাই সবচেয়ে ভালো সময় ছিল। বাবা বিয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দিকে কথাবার্তা চলছে। এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রীতিলতা মনে মনে হাসে। বেতনের টাকা পেলে সবার জন্য কাপড় কিনে আনে।

'এ কী করেছিস? এত কাপড় কিনেছিস কেন?'

বাবা-মার দুচোখে অবাক বিস্ময়।

'মা, দেখ তো তোমার শাড়িটা পছন্দ হয়েছে কী না?'

'কী যে বলিস! এত সুন্দর শাড়ি কি আমি জীবনে দেখেছি!'

প্রীতিলতার বাবা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'ঠিক বলেছ। তোমার জন্য আমি এত দামি শাড়ি কিনতেই পারিনি।'

প্রীতিলতা দেখে বাবার মুখে হাসি। মেয়ের কৃতিত্বে খুশি।

'সত্যি দিদি, তুমি আমাদের জন্য এত উপহার কিনেছ!'

ছোটো বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে যায় প্রীতিলতার। রামকৃষ্ণ থাকলে ওর জন্যও একটা উপহার কেনা হতো। কী সেটা। জানি না, জানি না। ঘরে ঢুকে রামকৃষ্ণের ছবিতে চুমু দেয়। চোখের জলে ভিজে যায় আঁচল। এভাবেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। এভাবেই বিদ্রোহের সামনে দাঁড়ানো। ক্রোধ এবং কান্না দুটোই ওর জীবনে সমান এখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বাবা-মা ভাবে, কী যে হল মেয়েটার। ওকে এখন আর বোঝা যায় না। যখন-তখন অন্যরকম হয়ে যায়।

প্রীতিলতার পলাতক জীবন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে নেতাদের বৈঠক বসে। প্রীতিলতাকে ক্লাব আক্রমণের নেত্রী ঠিক করে সূর্য সেন সবার উদ্দেশে বলেন, 'বাংলার বীর যুবকের আজ অভাব নেই। বালেশ্বর থেকে জালালাবাদ-কালারপুল পর্যন্ত এদের দীপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে বীর যুবকের রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও যে শক্তির খেলায় মেতেছে, ইতিহাসে সে অধ্যায় হোক এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ জানুক, এ দেশের মেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধে পিছনে নেই।'

সবাই এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

'আক্রমণের ব্যবস্থা নিখুঁত করার জন্য আমি নিজেই সবকিছু তদারক করব। আমি আজ রাতেই কাট্টলি গ্রামে চলে যাব। শান্তি চক্রবর্তী গোপনে প্রীতিলতাকে কাট্টলি নিয়ে যাবে।'

খবরটা শুনে প্রীতিলতা ডায়রিতে বড়ো বড়ো করে লেখে—২৩ সেপ্টেম্বর। ধলঘাটের ঘটনার পর প্রায় তিন মাসের ব্যবধান। কতগুলো পৃষ্ঠায় কয়েকটি কবিতার লাইন লিখেছে। এখন ওর মনে হয় একটা বিবৃতি লিখে রাখা উচিত। যদি ওখান থেকে জীবিত ফিরে আসতে না পারে?

এর মধ্যে ছোটো বোন শান্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। যে বাড়িটিতে ওরা আছে, সেটি লতাপাতায় ঘেরা মাটির দোতলা বাড়ি। ঘোড়ার গাড়ি, লরিতে চড়ে কিছুটা রাস্তা পার হয়েছে শান্তি। তারপর হাঁটতেও হয়েছে অনেকটা পথ। পরেছে ছেলেদের পোশাক। দিদি বলে যখন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে, তখন প্রীতিলতা ওর কাছ থেকে নিজ বাড়ির উঠোনের শ্বাসটুকু টেনে নেয়।

'বাবা-মা কেমন আছে রে? বড়দা-মেজদা-মঞ্জু-সন্তোষ?'

শান্তি উত্তর দিতে পারে না। কান্নায় ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আছে। পাশে দাঁড়ানো তারকেশ্বর বলে, 'কী রে শান্তি, দিদিকে দেখতে এলি বুঝি?'

প্রীতিলতা ওকে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসে। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। লতাপাতার ভেতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

থেকে বুনো ফুলের গন্ধ আসছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক দু-কান ভরে ধ্বনিত হচ্ছে। দিদি ওর দু-হাত ধরে রেখেছে। মনে হয় দিদির শরীরের উষ্ণতা অন্যরকম—ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো ডাক ওর শরীর জুড়ে বাজছে। ওর দু-চোখ জলে ভরে ওঠে, 'দিদি রে—'

দূরে বঙ্গোপসাগরের গর্জন শোনা যাচ্ছে। চারদিকে এত রকম শব্দের মধ্যে শান্তি বুঝতে পারে, ওই গর্জন দিদির বুকের থেকে উঠে আসছে। ওই গর্জনের আড়ালে কোথাও দিদির কান্না আছে। এই গোপন কান্নার কথা দিদি কারো কাছে বলে না। প্রীতিলতা বোনকে প্রশ্ন করে, 'কীসের শব্দ পাচ্ছিস বল তো?'

শান্তি ফিক করে হেসে বলে, 'সমুদ্রের।'

'জানিস, আমি মাঝে সাঝে ধ্যানের মতো এই শব্দ শুনি। মনে হয়, সমুদ্রকে বুকের ভেতর পুরে ফেলেছি।'

'আমি জানি।' শান্তির শান্ত কণ্ঠস্বর।

'জানিস?'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তোমার চোখের জল কেন পড়ে সেটা বুঝতে পারি না। তুমি নিজেকে আমাদের কাছে লুকিয়েছ। তোমার দুঃখ কোথায় দিদি?'

প্রীতিলতা ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, 'এ গ্রামের নাম কী জানিস? বলতে পারবি?'

'মনে হয় কাট্টলি গ্রাম।'

'কী করে বুঝলি?'

'কাছেই সমুদ্র, এ জন্য মনে হল।'

এ সময় তারকেশ্বর ঘরে ঢুকলে প্রীতিলতা বলে, 'দেখুন, শান্তি বলছে এটা নাকি কাট্টলি গ্রাম। না জেনেও ও ঠিকই ধরেছে। তাছাড়া ও তো কখনো কর্ণফুলি নদীর ওপারে যায়নি।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু ও বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবে না। ভোর হবার আগেই ওকে শহরে ফিরতে হবে। তোমাদের বাড়ির চারপাশে পুলিশের পাহারা থাকে। কারফিউ দেওয়া হয়। কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সকালে যদি ওরা বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি করে, তাহলে আর এক বিপদ হবে। রাত ফুরোবার আগে বোনের সঙ্গে কথা বলা শেষ করো।'

শান্তি কাঁদতে শুরু করে। প্রীতিলতা ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'কাঁদিস না। দুর্বল যারা, তারা কাঁদে। সাহসীরা সামনে এগোয়।'

শান্তি কথা বলে না। প্রীতিলতা ওকে ছোলা-মুড়ির বাটি এগিয়ে দিয়ে বলে, 'খা। আজ আমরা কেউ ভাত খাব না।'

'আমি তো ভাত খেতে আসিনি। তোমাকে দেখতে এসেছি দিদি। তুমি কয়দিন ভাত খাওনি?'

'ধর, তিন-চার দিন। ভাতই খেতে হবে এমন কথা নেই। একটা কিছু খেলেই হয়।'

'বুঝেছি।'

শান্তি বাটির উপর দৃষ্টি নামিয়ে মুড়ি নাড়াচাড়া করে। বলে, 'তুমিও হাত লাগাও, দুজনে একসঙ্গে খাই। কবে আমরা আবার একসঙ্গে হতে পারব, তা কে জানে!'

দুজনে ছোলা-মুড়ি খাওয়া শেষ করলে তারকেশ্বর দস্তিদার ঘরে ঢুকে বলে, 'তোমার যাওয়ার সময় হয়েছে শান্তি। অনেক রাত হয়েছে। এখন না গেলে ভোরবেলা পৌঁছোনো যাবে না। উঠে এসো।'

প্রীতিলতা ওকে হাসিমুখে বিদায় দেয়।

লম্বা পথ পায়ে হেঁটেই আসতে হয় ওকে। বাড়ির কাছাকাছি এলে দেখতে পায় পূর্ব আকাশে আলোর রেখা ফুটেছে। বাড়ির পেছনের ঝর্নার জল কুলকুল শব্দে বইছে—বাঁশঝাড়ে পাখিদের কিচিরমিচির তখনো থামেনি, পুকুরের ধারে উঠতেই দেখতে পেল প্রতিভা দাঁড়িয়ে আছে। শান্তি অস্ফুট স্বরে বলে, 'মাগো তুমি অপেক্ষায় আছ। আমি তো তোমাকে বলেই গিয়েছিলাম!'

শান্তির পায়ের গতি কমে যায়। নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়। দেখতে পায় মাকে এক ছোট্ট মেয়ের মতো লাগছে। মা বুঝি কতকাল ভাত খায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

১৯

একদিন সূর্য সেন আসে কাট্টলিতে। চা খেয়ে কথা বলতে শুরু করে। বলে, 'গিয়েছিলাম পাহাড়তলিতে। চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠ। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ঘেরা জায়গাটি সুন্দর। লাল-ইটের তৈরি রেল-কর্মচারীদের কোয়ার্টারগুলো যেন ছবির মতো সাজানো। আমাদের চট্টগ্রামের সৌন্দর্য তুলনাহীন, তারকেশ্বর। রেলগাড়ি ধোঁয়া ছেড়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে যায়।'

'আপনার কি মন খারাপ মাস্টারদা?'

'ভেব না যে, আমি শুধুই অঙ্কের মাস্টার। কেন একথা বলছি বুঝতে পারছ?'

কেউ কথা বলে না। সবাই চুপ।

এত কথা বলছি এজন্য যে, এ সৌন্দর্য আমার নয়। আমাদের নয়। এই দেশবাসীর নয়। এই শহরের একপ্রান্তে আছে সুসজ্জিত ইউরোপিয়ান ক্লাব। গভীর রাত পর্যন্ত এই ক্লাবে চলে নাচ-গান, ফুর্তি-উল্লাস। এরা শুধু এখানে আনন্দে মেতে থাকে না। এখানে বসে ওরা নানা পরিকল্পনা করে। শাসনের নামে মানুষদের নিপীড়নের পরিকল্পনা। মদের গ্লাসে ওরা শুধু শুধু সময় উড়িয়ে দেয় না।

আবার নিস্তব্ধতা।

আবার কথা শুরু হয়।

'শৈলেশ্বরের নেতৃত্বে ওই ক্লাব আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলাম কয়েকজন বিপ্লবীকে। মাস কয়েক আগের কথা। তোমরা নিশ্চয় ভুলে যাওনি?'

আবার নিস্তব্ধতা। এতো ভুলবার নয়। সেদিন শৈলেশ্বর দলবল নিয়ে ঠিকই পৌঁছেছিল ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে। দেখতে পেল ক্লাবঘর বন্ধ। বিশিষ্ট কোনো ইংরেজ মারা যাওয়ার কারণে সেদিন ক্লাবঘর বন্ধ ছিল শোক দিবস হিসেবে। এই খবরটি আগে সংগ্রহ না করার অপরাধ বোধে শৈলেশ্বর নিজেকে ক্ষমা করল না। ম্লানমুখে ফিরে এল আশ্রয়- কেন্দ্রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মাস্টারদার কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখে, পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে নিজের ভুলের পরিসমাপ্তি ঘটাল।

ঘটনাটি মাস্টারদাকে খুব ব্যথিত করেছিল। তাই শৈলেশ্বরের কথা স্মরণ করে বলে, 'আজ আমি শৈলেশ্বরের উত্তরসূরির কাছে কোনো ভুলের মাশুল এভাবে না দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। পটাসিয়াম সায়ানাইড তখনই ব্যবহার করতে হবে, যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। আমি বারবারই এই একটি কথা বলি। তারপরও শৈলেশ্বর ভুলের দায় থেকে নিজেকে মুক্তি দেয়নি। আমরা রামকৃষ্ণকে হারিয়েছি। আমরা বারবার বিপ্লবীদের হারাতে চাই না।'

মাস্টারদার মুখে রামকৃষ্ণের নাম শুনে প্রীতিলতা মৃদুস্বরে 'আসছি' বলে উঠে পড়ে। দ্রুতপায়ে নীচে নেমে আসে। কুয়ো থেকে জল তুলে দুহাতে চোখের জল ধুতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে আবার ফিরে আসে। দেখতে পায়। সবগুলো চোখ ওর উপর এসে পড়েছে। ও খানিকটুকু বিব্রত হয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে।

ওর দিকে তাকিয়ে মাস্টারদা বলে, '২৩ তারিখ। ২৩ সেপ্টেম্বর। পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হবে। তুমি দলনেত্রী।'

'আমি? আমি কেন দলনেত্রী? আমাদের যোগ্য ভাইয়েরা রয়েছে। আমি একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করতে চাই।'

'আমি যা সিদ্ধান্ত নিই, সঠিকভাবেই নিই। আমি জানি তুমি পারবে।'

সূর্য সেন প্রীতিলতাকে শাসন করে।

প্রীতিলতা সূর্য সেনকে প্রণাম করে বলে, 'আমি এই অভিযান সফল করবই। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসব না। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

'তোমার ওপর আমার গভীর বিশ্বাস আছে। তোমার এই অভিযান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর নারীদের অগ্রযাত্রার গতিকে ত্বরান্বিত করবে। নারী-পুরুষের যৌথ সংগ্রামে স্বাধীনতার বীজ মহিরুহ হবে ফুলতার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা এক অদ্ভুত অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন দায়িত্ব পেয়ে ওর সাহস বেড়ে যায়। ও জানে, ওর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা ওর কাছে সঞ্চিত আছে। আছে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আর আত্মদানের সংকল্প। এটুকু অবলম্বন করেই ও এতবড়ো দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

রাত অনেক হলে প্রীতিলতা মাকে লিখতে বসে। কুপির মৃদু আলো বদ্ধ-ঘরে চিঠির কাগজের ওপর স্থির হয়ে থাকে।

'মাগো,

তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার যেন মনে হল তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছ, আর তোমার অশ্রু জলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে চলে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম—তুমি তোমার আদরের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে! কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দু-চোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মোছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো—তোমায় বড়ো ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা না। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না! এ জন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝো না তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে, তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছো - 'ওগো তোমরা আমার রানি-শূন্য রাজ্য দেখে যাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলো আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে কান্নার সুর তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য—স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?

কী করবে মা? দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা।

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?

আর কেঁদো না মা। যাবার আগে আর একবার তুমি আমার স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব।

আমি যে তোমার মনে বড়োই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছ, আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছ—আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কী আশ্চর্য মা! তোমার রানি এত নিষ্ঠুর হতে পারল কী করে? ক্ষমা করো মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো।'

চিঠির দিকে তাকিয়ে থেকে ও নিজের বাড়ির আঙিনা, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, পুকুরপাড়, বারান্দা, শোবার ঘর—সবখানে মাকে খুঁজে ফেরে। ভাবে কোথাও না কোথাও মা ওর জন্য অপেক্ষায় আছে। চোখের জলে সবটুকু ভেসে গেলে চিঠির নীচে ওর নাম স্বাক্ষর করা হয়ে ওঠে না আর। শুধু খামের উপর লেখে—আমার কিছু ঘটে গেলে এই চিঠি মায়ের কাছে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রীতিলতা ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে বিছানায় যায়। স্বপ্ন সার্থক হওয়ার অভিপ্রায়ে ও প্রবলভাবে রামকৃষ্ণকে স্মরণ করে। তুমি যাওয়ার সময় তোমাকে আমি দেখতে পাইনি কৃষ্ণ। আজ আমার ডিরেক্ট অ্যাকশনের সময় হয়েছে। তুমি যেখানেই থাক, আমার দিকে তাকিয়ে থাক। তোমার সাহস আর প্রতিজ্ঞা থাকবে আমার হৃদয়ে। আমি কোনো ভুল করব না।

কাট্টলির সাগরতীরে বঙ্গোপসাগর গর্জন করে। সেখানে প্রীতিলতা ও তার অন্য সাথিদের অস্ত্রশিক্ষা শুরু হয়েছে। সঙ্গে থাকবে মহেন্দ্র, সুশীল, শান্তি চক্রবর্তীসহ আরো দু-তিনজন। আগের শিক্ষাকে নতুন করে ধার দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে মিলিয়ে যায় রিভলবারের গুলির শব্দ। মাঝে মাঝে বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকালে মনে হয় ওই সমুদ্রই ওর হৃদয়। অনবরত সেখানে এমন গর্জন উঠছে—তরঙ্গ ভাঙছে—গড়াচ্ছে—বড়ো বেশি অশান্ত।

দুদিন পরে মোম জ্বালিয়ে গভীর রাতে ও একটি বিবৃতি তৈরি করে। যদি জীবিত ফিরে আসতে না পারে, তাহলে দেশবাসী ওর বিবৃতি পড়ে জানবে যে ও কী করতে চেয়েছিল। একটি সাদা কাগজে ও লিখতে আরম্ভ করে :

আমি বিধিপূর্ব ঘোষণা করিতেছি যে, যে-প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, অত্যাচারের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক, আমি সেই ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্যা।

এই বিখ্যাত 'চট্টগ্রাম শাখা' দেশের যুবকদের দেশপ্রেমকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। স্মরণীয় ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল এবং উহার পরবর্তী পবিত্র জালালাবাদ পাহাড় ও পরে চাঁদপুর, সমীরপুর, ফেনী, ঢাকা, কুমিল্লা, চন্দনানগর ও ধলঘাটের বীরোচিত কার্যসমূহ ভারতীয় মুক্তিকামী বিদ্রোহীদের মনে এক নতুন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আমি এইরূপ গৌরবমন্ডিত একটি সংঘের সদস্য হইতে পারিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী অনুভব করিতেছি।

আমরা দেশের মুক্তির জন্যই এই সশস্ত্র যুদ্ধ করিতেছি। অদ্যকার, পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ব্রিটিশ জোরপূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর রক্ত শোষণ করিয়া তাহারা দেশে নিদারুণ দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের এবং সকল অধঃপতনের একমাত্র কারণ। সুতরাং তাহারাই আমাদের একমাত্র শত্রু। স্বাধীনতা লাভ করার পথে তাহারাই আমাদের একমাত্র অন্তরায়। যদিও মানুষের জীবন সংহার করা অন্যায়, তবু বাধ্য হইয়া বড়ো বড়ো সরকারি কর্মচারীর যে-কোনো বাধা বা অন্তরায় যে-কোনো উপায়ে দূর করার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমাদের দলের মহামান্য ও পূজনীয় নেতা মাস্টারদা, অদ্যকার এই সশস্ত্র অভিযানে যোগ দিবার জন্য আমাকে ডাক দিলেন, তখন আমি নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলাম। মনে হইল, এতদিনে আমার বহু প্রত্যাশিত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আমি এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিলাম। এই উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্ব, যখন আমার মতো একটি মেয়েকে এই গুরুভার অর্পণ করেন, তখন এতগুলো কর্মঠ ও যোগ্যতর ভাইয়েরা বর্তমান থাকিতে অভিযানে নেতৃত্বের ব্যাপার একজন ভগিনীর উপর কেন ন্যস্ত হইবে —এই বলিয়া আমি আপত্তি জানাইলাম এবং একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে ওই কাজে যাইতে চাহিলাম।

কিন্তু আমি পরে পূজ্য নেতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলাম।

আমি মনে করি যে, আমি দেশবাসীর নিকট আমাদের কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যবশত এখনো হয়তো আমার প্রিয় দেশবাসীর মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা বলিবেন যে, ভারতীয় নারীদের ঊর্ধ্বতন আদর্শে লালিত একটি নারী কী করিয়া নরহত্যার মতো এই ভীষণ হিংস্র কাজে লিপ্ত হইল?

দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না? ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে, রাজপুত রমণীরা অসীম সাহসের সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা শত্রুর প্রাণ সংহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এইরূপ আরও কত নারীর বীরত্বগাথায় পূর্ণ। তবে কেন আমরা, আজিকার ভারতীয় নারীরা বিদেশির দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নিজের দেশকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য এই মহান যুদ্ধে যোগদান করিব না? যদি বোনেরা ভাইদের সঙ্গে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, তবে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানে তাহাদের বাধা কী? সশস্ত্র বিদ্রোহে অন্য দেশের বহু নারী যোগদান করিয়াছে, তবে কেন ভারতীয় নারীরা বিপ্লবের এই পন্থাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিবে?

নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে, আমাদের দেশের ভগিনীরা আজ নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন—এই আশা লইয়াই আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ইং

বিবৃতি লিখে প্রীতিলতা যত্নের সাথে ভাঁজ করে ডায়রিতে রাখে। একজন তো জানত আমি কী চাই। সে এখন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বলতে ইচ্ছে করে, রামকৃষ্ণ তুমি যেখানেই থাক আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দাও। আমি তোমাকে স্পর্শ করি। আমার শরীরে আগুন। আমি পুড়ে যাচ্ছি।

পরক্ষণে আবার ডায়রির সাদা পৃষ্ঠা বের করে পেনসিল কেটে নেয়। কয়েকটি লাইন লিখে নিজের ভেতরটা শান্ত করতে চায়—

দ্য থট অব মাই কান্ট্রি ওয়াজ এভার প্রিডমিন্যান্ট ইন মাইন্ড অ্যান্ড ওয়াজ কেপ্ট এভার ফ্রেস বাই দ্য টিয়ারস অব মাদার্স পোর্নিং দ্য লস অব দেয়ার বিলাভেড সনস হু স্যাকরিফাইসড দেয়ার লাইভস অ্যাট দ্য অল্টার অব ফ্রিডম।

উইথ অল দিস, আ নিউ ইনপেটাস কেইম টু মি হোয়েন আই ওয়াজ আসকড বাই ওয়ান অব মাই রিভলিউশনারি কমরেডস টু ভিজিট রামকৃষ্ণদা ইন দ্য আলিপুর সেন্ট্রাল জেইল, হোয়ার ইন আ সলিটারি সেল হি ওয়াজ অ্যাওয়েটিং এক্সট্রিম পেনাল্টি মেটেড আউট টু হিম বাই দ্য ব্রিটিশ ল ফর হিজ লাভ অব কান্ট্রি। আই পাসড ফর আ কাজিন সিস্টার অব রামকৃষ্ণদা অ্যান্ড এনি হাউ ম্যানেজড টু ইন্টারভিউ এভরি ডে দিস ফ্লেমি লাইভলি ইয়াং হিরো। আই হ্যাড অ্যাবাউট ফরটি ইন্টারভিউজ উইথ হিম বিফোর হিজ এক্সিকিউশন। হিজ ডিগনিফাইড লুক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ফ্রি কনভারসেশন, কাম সারেনডার টু ডেথ, সিনসিয়ার ডেভোশন টু গড, চাইল্ড লাইক সিম্পলিসিটি, লাভিং হার্ট অ্যান্ড প্রফাউন্ড রিয়ালাইজেশন ইমপ্রেসড মি ভেরি ডিপলি অ্যান্ড মেইড মি টেন-টাইমস মোর ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ডিটারমাইন্ড দেন হোয়াট আই হ্যাড বিন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব দিজ ডাইং প্যাট্রিয়ট মেইড আ গ্রেট কনট্রিবিউশন টু দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব মাই লাইফ টুওয়ার্ডস পারফেকশন। আফটার রামকৃষ্ণদা'স এক্সিকিউশন মাই হ্যাংকারিং আফটার সাম প্র্যাকটিকাল রিভলিউশনারি অ্যাকশন গ্রিউ মোর ইনটেনস। হাউএভার, আই হ্যাড টু পাস নাইন মানথস মোর ইন ক্যালকাটা ফর মাই বিএ এক্সামিনেশন। ইন দ্য মিন টাইম আই ট্রাইড সেভেরাল টাইমস টু হ্যাট অ্যান ইন্টারভিউ উইথ 'মাস্টারদা' বাট আই ফেইলড।

আফটার মাই এক্সামিনেশন ইন নাইনটিন থারটি টু, আই হারিড টুওয়ার্ডস হোম উইথ আ স্ট্রং ডিটারমিনেশন টু ইন্টারভিউ 'মাস্টারদা' এনি হাউ। ইন আ ফিউ ডেইস মাই চেরিসড ডিজায়ার ওয়াজ ফুলফিল্ড অ্যান্ড আই সুন স্টুড বিফোর মাস্টারদা অ্যান্ড নির্মলদা, দ্য টু গ্রেট পারসনালিটিস দেন গাইডিং দ্য চিটাগঙ্গ রিভলিউশনারি অর্গানাইজেশন।

এটুকু লিখে থামে প্রীতিলতা। আগেও খানিকটুকু লিখেছিল। ডায়রি বন্ধ করতে করতে ভাবে, বাকিটুকু আর একদিন লিখবে। ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের আগে লেখা শেষ করতে হবে। যদি আত্মদান করতে হয়, তার আগে নিজের কথাগুলো জানিয়ে যেতে হবে অন্য বিপ্লবীদের। আকস্মিকভাবে ওর মনে হয়, ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। বালিশের নীচে ডায়রিটা রেখে ঘুমোনোর আগে রামকৃষ্ণের কথা মনে হয়। সুদর্শন মানুষটি স্বপ্নের ভেতর হেঁটে যায়। মনে হয় এই মুহূর্তে রামকৃষ্ণ কাট্টলির সমুদ্রতটে হেঁটে যাচ্ছে। বলছে, যে দায়িত্ব পেয়েছ তার সঙ্গে আমিও আছি। সাহসী মেয়ে তোমাকে অভিবাদন।

চোখ বুজে আসে প্রীতিলতার। ঘুম আসে না। চোখের জল যদি এত গড়ায়, তবে ঘুম আসবে কেমন করে? দুহাতে বালিশ আঁকড়ে রেখে প্রীতিলতা নিজেকে সামলায়। আর ক-দিন পরই ওর হাতে ইতিহাসের একটি ভিন্ন সময় তৈরি হবে। কে আর রুখবে বালির বাঁধ? ও উঠে বসে। মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু তেমন কথা বলার সুযোগ নেই। ও ভাবে, মাস্টারদাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি চিঠি লিখে রেখে যাওয়া ঠিক হবে। আর যদি ফেরা না হয়, তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তিনি চিঠিটি পাবেন এবং পড়বেন। আর যদি ফেরা হয়, তাহলে চিঠিটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। একদম মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রাখবেন। স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে। ও কাগজ আর পেনসিল বের করে লিখতে বসে।

শ্রীচরণেষু—

দাদা, ভেবেছিলাম আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে আমার দাদার নিরালা জীবনে একটুখানি আনন্দ দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু ভগবান হঠাৎ যেন সব উলটে দিলেন। ছুটোছুটি করে সবাইকে চলে আসতে হল— তারপর যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা একান্ত মনে যা চেয়েছি, তার পথে এত বাধা আমার মনে যে বড়োই ব্যথা দিচ্ছে দাদা। অনেক কিছুই মনে হচ্ছে, যাক আপনার আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না কখনো, আমি জানি। আমার উদ্দেশ্য সফল হবেই, নইলে যে আমি একেবারে মরিয়া হয়ে যাব। যাক, এসব লিখব তা তো ভাবিনি।

আজ আপনার কাছে চিঠি লিখতে বসে ভাবছি, আমি কার কাছে চিঠি লিখব? আমি যে তাঁর উপযুক্ত বোন হতে পারলাম না। তাঁর অগাধ স্নেহের মর্যাদা আমি যে রক্ষা করতে পারলাম না। কত অবাধ্যতা করেছি, কত মনে কষ্ট দিয়েছি, বুঝিনি যে ভগবান, আমাকে অমূল্য সম্পদই দিয়েছেন। যাক্।

সোনাদা ও মেজদা এসেছিল। খুব ভালো লাগল তাদের সঙ্গে কথা বলতে—তারা আমাকে দেখে খুব খুশি—একেবারে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। মা নাকি খুব কাঁদেন—কাঁদতে কাঁদতে হয়রান হয়ে যান। রোজই কাঁদেন। বাবা কিছু ক্ষান্ত হয়ে গেছেন, তবে বাবার খুব লেগেছে। আমার কাপড়-চোপড়গুলো শুকিয়ে রেখে দেবার জন্য বলে দিয়েছেন, তা কেউ ব্যবহার করলে বকুনি দেন। মঞ্জুটির খুব অসুখ। গাল ফুলে গেছে, কিছু খেতে পারে না। এবং জ্বরও হয়েছে— রাত দুপুরে উঠে নাকি আমাকে ডাকে।

দাদা! আমার মনে আজ বড়োই ব্যথা। আমি কি মানুষকে কষ্ট দিতেই শুধু সংসারে এসেছিলাম। আমি যে তা চাই না। লক্ষ্মীটি দাদা, এ হতভাগা বোনটিকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। জানি, স্নেহের বোনটিকে ভুলবেন না, কিন্তু আমার সে কথাই বলতে ইচ্ছা করছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আমার স্মৃতি যে আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। শরীর ভালো আছে। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—স্নেহের ফুলতার

নিজের নামটি লেখার পরে এবার ওর মনে হচ্ছে ওর দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসছে। বালিশে মাথা রাখলে ওর ঘুম আসে। প্রগাঢ় ঘুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রস্তুতি সম্পন্ন। সময় গড়িয়েছে। প্রতিটি মুহূর্ত শুধু সময়ের গড়ানোর হিসেব নয়, প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিফলিত হয়েছে জীবন-বিন্দুতে সিন্ধুর প্রতিচ্ছবি। এই পরিসর প্রীতিলতার সামনে বারবারই ফিরে আসে—লং লিভ রিভলিউশন স্লোগান নিয়ে।

ক্লাব-আক্রমণের নির্ধারিত দিন এসে পড়ে। ক্লাবের মুসলমান বাবুর্চির সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে। চাকুরি জীবনে বাবুর্চি ইংরেজ নরনারীর কাছ থেকে অনেকবার অপমানজনক ব্যবহার পেয়েছে। তাই ও সহজেই বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে যায়। ক্লাব-সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এসে গেছে ওদের হাতে। ক্লাবের দরজা-জানালার সংখ্যা, প্রবেশ ও বেরুনোর পথ, নাচে ব্যস্ত থেকে কখন প্রচুর মদ পান করে ইংরেজ অফিসাররা অসতর্ক থাকবে, ক্লাবের পাহারায় নিযুক্ত সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা কত—সব জানিয়েছে বাবুর্চি। ওর সঙ্গে আরো ঠিক হয় যে, রান্নাঘরের ছোটো জানালা দিয়ে আলোর সংকেত দিলে আক্রমণ শুরু হবে। বাবুর্চির গ্রামের বাড়িতে গিয়ে এইসব ঠিক করে বিপ্লবীরা।

নির্ধারিত দিন এসে পড়ে। ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। প্রীতিলতার সঙ্গে আছে আরও চারজন বিপ্লবী সাথি। সময় রাত দশটা। খাকি সামরিক পোশাক পরে নেয় প্রীতিলতা। কোমরে চামড়ার কটিবন্ধে গুলিভরা রিভলবার ও চামড়ার খাপে গুর্খা ভোজালি। পায়ে মোজা ও বাদামি রঙের ক্যানভাসের রাবার সোল জুতো। মাথার লম্বা চুল সুসংবদ্ধ করে তার ওপর বাঁধা হয়েছে সামরিক কায়দায় পাগড়ি। এখন আর মনেই হয় না যে, ও একটি মেয়ে। পোশাক পরা হয়ে গেলে প্রীতিলতা সন্তর্পণে বাকি কাজটুকু শেষ করে। বিপ্লবীদের নিয়ম অনুযায়ী পকেটে ঢোকায় বিষের মোড়ক। ধরা পড়ে গেলে দলের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এবং যাতে কোনো অসম্মান না হতে হয় সেজন্য, এই স্বেচ্ছামৃত্যুর ব্যবস্থা। সামরিক পোশাকের বাম দিকের বুক পকেটে রাখে রামকৃষ্ণর ছবি—মনে মনে বলে, তুমি আমার সঙ্গেই আছ। যদি তেমন পরিস্থিতি হয়, আমি তোমার কাছে পৌঁছে যাব কৃষ্ণ। আমাদের জন্য পরজন্মই ভালো। আর-এক জীবনে আমরা মুক্ত স্বাধীন দেশের মানুষ হব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ও দ্রুতহাতে পোশাকের ডান দিকের পকেটে ইউরোপিয়ান ক্লাবের প্ল্যান রাখে। নিজের লেখা বিবৃতি ও মুদ্রিত ইস্তেহারটি রাখে পোশাকের ভেতর। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে হুইসেলটি। শেষ মুহূর্তে হুইসেল বাজিয়ে সাথিদের জড়ো করে পালাতে হবে। শেষে রাখে তার নিজের ছবিসহ ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সূর্য সেনের সই-করা লাল রঙের একটি ইস্তেহার।

তৈরি হয়ে বাইরে এসে দেখে, সাথিরা প্রত্যেকে তৈরি। অন্যান্য বিপ্লবীদের কাছে আছে অস্ত্রাগার থেকে দখল করা রাইফেল, কোমরে রিভলবার ও ভোজালি, কাঁধের ঝোলায় বোমা। প্রীতিলতা নিজের এই বাহিনীর দিকে তাকিয়ে গৌরবের আবেগে স্থিত হয়ে থাকে। সূর্য সেন ওদের বিদায় জানায়। প্রীতিলতা বলে, 'আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

স্মিত হেসে সবার মাথা ছুঁয়ে তিনি বললেন, 'বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবে।'

প্রীতিলতা সূর্য সেনকে প্রণাম করে এক মুহূর্ত কাছে দাঁড়ায়। তারপর সাথিদের নিয়ে রাস্তায় নামে। বাইরে অন্ধকারে ওদের শরীর মিলিয়ে যায়।

ক্লাবের কাছাকাছি নির্ধারিত স্থানে এসে ওরা অপেক্ষা করে। ওরা জানে, টর্চ একবার জ্বলবে আবার নিভবে। এভাবে তিনবার হলে বুঝতে হবে যে, চূড়ান্ত সংকেত দেওয়া হয়েছে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতেই বাবুর্চির টর্চ জ্বলে ওঠে। এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার অবসান হয়। সঙ্গে-সঙ্গে 'চার্জ'—এই আদেশ দিয়ে প্রীতিলতা রিভলবারের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যায়। গুলিবর্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে বোমা ছোঁড়ে অন্য সাথিরা। হলরুমের ভেতরে নেমে আসে মৃত্যু-চিৎকার। পাহারারত পুলিশেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে। বিভিন্ন দরজা দিয়ে দু-চারজন ইংরেজও পালিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রীতিলতার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন হয়। আক্রমণের নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের সময়ে নেতা থাকবে সামনে, ফেরার সময় নেতা থাকবে পেছনে। তাই সাথিদের সামনে দিয়ে প্রীতিলতা গর্বে-আনন্দে ক্লাবের সামনের রেলের বড়ো রাস্তায় উঠে আসে। সাথিরা সামনে এগিয়ে গেছে। পেছনে ও একা। দ্রুত হাঁটছে। রাস্তা পার হয়ে প্রায় পৌঁছে গেছে পাহাড়তলি রেলওয়ে কারখানার উত্তর দিকের ছোটো পায়ে-হাঁটা পথে। পথের মাথায় রেলের ওভার-ব্রিজ। ব্রিজ পেরুলে পাহাড়তলি বাজার। প্রীতিলতার মনে হয়, সামনেই পোতাশ্রয়। আর একটু পথ। এটুকু পেরতে পারলেই ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পৌঁছে যাবে সাফল্যের বন্দরে। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, 'আমি জানি না, এখন কোন নক্ষত্র হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ তুমি। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কৃষ্ণ, যে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। প্রতিশোধ তোমাদের মতো অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর, যাদের লাল রক্তে ইতিহাসে তৈরি হয়েছে একটি নদী—যার নাম লিখি। সে নদীর কাছে গেলে দুঃখ ভোলা যায়। ও বড়ো শ্বাস নেবার জন্য হাঁ করতেই একটি গুলি এসে ওর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। লুটিয়ে পড়ে প্রীতিলতা।

একজন ইংরেজ অফিসার পালিয়ে এসে ক্লাবের পশ্চিম দিকের নালায় লুকিয়ে ছিল। বিপ্লবীদের কাজ সেরে ফিরে যেতে দেখে ও। কোমরের রিভলবার বের করতে যতটুকু সময়—দলের শেষ মানুষটিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়ে গুলি। প্রশস্ত রাজপথের উপর মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরায় প্রীতিলতা। পোশাক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। জানে, এভাবেই ওর মরণ হবে। কিন্তু কখন? দেরি ওর সহ্য হয় না। নিস্তব্ধ চারপাশ। মাথার ওপর অন্ধকার রাত্রি। কোথাও কেউ নেই। এ এক অদ্ভুত সময় ওর জীবনে। ও এখন রামকৃষ্ণর সঙ্গে একা। হাত বাড়ালেই ধরতে পারে রামকৃষ্ণর হাত। ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। পকেট থেকে পটাসিয়াম সায়ানাইডের মোড়কটি বের করে মুখে ঢেলে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তীব্র বিষক্রিয়ায় নিস্তব্ধ হয়ে আসতে থাকে প্রীতিলতার শরীর। চোখের পাতা বুজতে থাকে। ওই চোখ আর কখনো দেখবে না একটি ছবি—যে ছবি সামরিক পোশাকের বাম পকেটে। যে পকেটটি হৃৎপিন্ডের ওপর—আর একটু পরে যে হৃৎপিন্ডের ধুকপুক শব্দ নিস্পন্দ হয়ে যাবে। ওর ডান হাত উঠে আসে পকেটের ওপর। ছুঁতে চায় সে ছবি। একজন যুবকের ছবি—তারুণ্যদীপ্ত দৃষ্টিতে হাজার তারার দ্যুতি। যে দ্যুতি অমরজ্যোতি—যাকে গ্রহণ করার জন্য একজন নারী তার সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। যে একদিন রামকৃষ্ণকে বলেছিল, তোমার ওই দ্যুতিটুকু আমার হৃদয়ে রেখে যাও। আমি চাই না পৃথিবীর আলো। চাই একটি গভীর দৃষ্টি। যে-দৃষ্টি অন্ধকারে আলো হয়ে নিভে যাবে মরণের সড়কে। যা কোনোদিন নিভবে না—নিভবে না—এই নিভে না-যাওয়া অলৌকিক আলো যতই তীব্র হয়ে ফুটতে থাকে, ততই প্রীতিলতার চোখ থেকে নিভে যায় পৃথিবীর আলো—যে আলো সাধারণ—যা সবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

২২

পরদিন ঘুম থেকে জেগে জগবন্ধু জানতে পারে তার, মেয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে প্রাণ দিয়েছে।

জগবন্ধু চিৎকার করে ডাকে, 'রানি, রানি!'

আশপাশের বাড়ির লোকেরা প্রথমে রানির বাড়িতে ভিড় করে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বিপদের ভয়ে দ্রুত সরে যায়। সকলের কানে বাজে জগবন্ধুর কণ্ঠস্বর : 'কাল রাতে রানি পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে।'

কিছুক্ষণ পরে পুলিশ এসে জগবন্ধুকে কোতোয়ালিতে নিয়ে যায়। স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে বসে থাকে শোকাহত বাবা। শুনতে পায় রানির কণ্ঠস্বর—বাবার চাকরি চলে যাওয়ার কথা শুনে বলেছিল, 'ভয় কী বাবা? তুমি একটুও ভেবো না। বিএ পাস করেই আমি চাকরি করব। ভাইবোনদের মানুষ করব।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা জগবন্ধু হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বলতে থাকে, 'এত ভরসা কেন দিয়েছিলি তুই আমাকে! এ-ই যদি মনে ছিল তোর!'

তার চিৎকারে কোনো কোনো বাঙালি পুলিশ ঘুরে তাকায় তার দিকে। তার কান্না থামলে একজন সার্জেন্ট এসে বলে, 'দেয়ার ইজ আ ডিপ উন্ড ইন হার ব্রেস্ট, পারহেপস শি কুড নট ফ্লি অ্যাওয়ে উইথ হার কমরেডস অ্যান্ড দে শট হার ডেড।

জগবন্ধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এসব কথা শুনে এখন আর কী হবে! বাইরে দিনের আলো বাড়ছে। রোদ ছড়িয়েছে কোতোয়ালির প্রাঙ্গণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মর্গে প্রীতিলতার লাশ।

পোস্টমর্টেমের জন্য মাথার পাগড়ি টান দিয়ে খুলে ফেললে ছড়িয়ে পড়ে ওর দিঘল কেশ—ঘন, কালো, চকচকে। রামকৃষ্ণের ভাষায়, দোয়েলের পুচ্ছের মতো কেশরাজি। পাখা মেলে উড়ে গেলে ওই কেশরাজি ছড়িয়ে যায় নীলিমায়—যে নীলিমা মানুষেরই হৃদয়—যেখানে দোয়েলের চকচকে ঠোঁটে উঠে আসে ভালোবাসার শস্যকণা। যে শস্যকণা পাবার আশায় প্রসারিত হয় কোটি হাত। রামকৃষ্ণ বলে, 'প্রীতিলতা আমি তোমার কেশরাজির অরণ্যে আমার টকটকে লাল হৃদয় ফুল করে গুঁজে দিলাম। কখনো খুলে রেখো না সে ফুল। দেখো যেন ঝরেও না যায়।'

প্রীতিলতা হাসে। বলে, 'আমি যদি বৃষ্টি হই, তবে তোমার ওই ফুলে অনবরত সিঞ্চিত হবে জল। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে—মেঘ থাকবে—ততদিন আমার চুলে তোমার ফুল থাকবে। আমার কেশরাজিতে প্রোথিত তোমার হৃদয় আমরা রেখে যাব অনাগতকালের মানব-মানবীর জন্য, যারা ভালোবাসাকে দ্যুতিময় করবে। আমাদের মতো বলবে, মহাকাল দু-দণ্ড থাম। আরো কিছুক্ষণ ভালোবেসে যেতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পোস্টমর্টেমের পরে চুক্তিপত্র সই করে প্রীতিলতার মৃতদেহ সৎকারের জন্য গ্রহণ করে জগবন্ধু। চুক্তিপত্রে লেখা, ছিল কোনো শোভাযাত্রা চলবে না, পনেরো জনের বেশি লোক শ্মশানে যেতে পারবে না।

জগবন্ধু একটি নতুন শাড়ি কিনে মেয়েকে শ্মশানে নেওয়ার ব্যবস্থা করল।

প্রতিভার মনে হল শবযাত্রায় স্লোগান নেই, ফুলের মালা নেই। হাজার হাজার মানুষ নেই। এমনটি তো হওয়ার কথা নয়।

প্রীতিলতার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসে—'মাগো, দুঃখ কেন? এই মৃত্যু কোনো দিনের ঘটনা মাত্র নয়। এই মৃত্যুর পেছনে দেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন আছে।'

আরোও বেশি বই পড়তে আজই আমার ওয়েব সাইটে চলে আসুন। আমাদের ঠিকানা আমারবই.কম'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com